যদিও সন্ধ্যা

হুমায়ূন আহমেদ

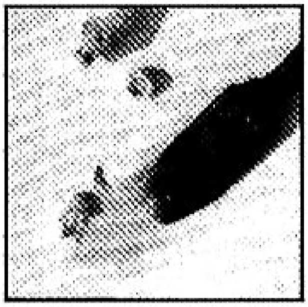

জংলামতো ছায়াময় জায়গা। আধো আলো আধো অন্ধকারে দু'টা কচুগাছ। একটা কচুগাছে রোদ এসে পড়েছে। তির্যক আলো পড়ার জন্যেই হয়তো কচুপাতার সবুজ রঙ ঝলমল করছে। দুটি কচুপাতাতেই শিশির জমে আছে। চিকমিক করছে শিশির।

শওকতের ইচ্ছা করছে কচুপাতায় আস্তে করে টোকা দিতে। যাতে শিশিরবিন্দুগুলি গড়িয়ে পড়ে। ঝরে পড়ছে শিশির দেখতেও খুব সুন্দর লাগার কথা। কাজটা করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ দৃশ্যটা বাস্তব না। জলরঙে আঁকা ছবি। ছবির পাতায় টোকা দিয়ে শিশির ঝরানো যাবে না। ছবিতে সময় স্থির হয়ে থাকে। 'সময়কে আটকে দিতে পারেন শুধুমাত্র চিত্রকররা।' —কার কথা যেন ? ও আচ্ছা, ব্রিটিশ পেইন্টার কনস্টবলের কথা। ইনি সাত বছর ধরে এঁকেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি— Landscape with trees and a distant mansion.

এই ছবিটা কনস্টবল সাহেবকে দেখাতে পারলে হতো। শওকত বলত, আচ্ছা স্যার, আপনার কি ইচ্ছা করছে না কচুপাতায় টোকা দিয়ে শিশিরবিন্দু ঝরিয়ে দিতে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে কনস্টবল সাহেব তার দিকে কঠিন চোখে তাকাতেন, জবাব দিতেন না। তখন শওকত বলত, স্যার, আপনার তো ডিটেল কাজের দিকে ঝোঁক। এই ছবির ডিটেলের কাজ দেখেছেন ? আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন জলরঙে ডিটেলের কাজ করা খুবই কঠিন। ছবির গ্রান্ডমাস্টাররা এই কারণেই জলরঙ পছন্দ করতেন না।

শওকত প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। নতুন প্যাকেট। এখনো খোলা হয় নি। এই বাড়িতে সিগারেট খাওয়া যায় কি-না সে জানে না। আজকাল প্রায় বাড়িতেই সিগারেট ধরানো নিষিদ্ধ। এটা একটা নতুন ফ্যাশন। সিগারেট ঠোঁটে দেয়ামাত্র ঘরের কর্ত্রী চোখ কপালে তুলে বলবেন—

ভাই, এই বাড়ি স্মোক-ফ্রি। সিগারেট খাবার জন্যে বারান্দায় জায়গা করা আছে। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।

এ বাড়ির ড্রয়িংরুমের সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে— এ বাড়িটাও স্মোক-ফ্রি। শওকত যেখানে বসে আছে, তার পাশেই সাইড টেবিলে অবশ্যি একটা এসট্রে রাখা আছে। ক্রিস্টালের তৈরি এসট্রে। এত সুন্দর যে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলতে হলে বুকের কলিজা বড় হওয়া লাগে। দেখে মনে হচ্ছে না কেউ এখানে কোনোদিন ছাই ফেলেছে।

ড্রয়িংরুম ফাঁকা। সিগারেট ধরানো মাত্র কেউ বলবে না— এই বাড়ি স্মোক ফ্রি। তারপরেও শওকত মন স্থির করতে পারছে না। সে বসে আছে পনের মিনিটের মতো হয়েছে। এর মধ্যে একজন বাবুর্চি টাইপ লোক শান্তিনিকেতনি ভাষায় বলেছে, আপনাকে চা দেব ? শওকত বলেছে, হ্যাঁ। সেই চা এখনো আসে নি। একা একা বসে থাকতে শওকতের খুব যে খারাপ লাগছে তা না। অতি বড়লোকদের ড্রয়িংরুমে এমন সব জিনিস থাকে যা দেখে সুন্দর সময় কাটানো যায়।

কোনো কোনো বাড়ির ড্রয়িংরুম মিউজিয়ামের মতো সাজানো থাকে : মুখোশ, গালার তৈরি মূর্তি, পাথরের মূর্তি, কষ্টিপাথরের মূর্তি, লাফিং বুদ্ধা। আবার কিছু ড্রয়িংরুম হয় আর্ট গ্যালারি। বিখ্যাত সব পেইন্টারদের ছবি। যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, ফিদা মকবুল হোসেন। দেশীয় পেইন্টারদের মধ্যে জয়নুল আবেদীন ছাড়া আর কেউ পাত্তা পান না।

আবার কিছু কিছু বাড়ির ড্রয়িংরুম দেখে মনে হয়— ট্রাভেল এজেন্সির অফিসে ঢুকে পড়া হয়েছে। পৃথিবীর নানান দেশের নানান জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো। গৃহকর্তা যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন, সেসব দেশের কিছু না কিছু জিনিস কিনেছেন। এস্কিমোদের মাথার ফার টুপি থেকে ইফেল টাওয়ারের ক্রিস্টাল রেপ্লিকা। কিছুই বাদ নেই।

এই বাড়ির ড্রয়িংরুমের চরিত্রটা শওকতের কাছে এখনো পরিষ্কার হয় নি। দর্শনীয় একটা ঝাড়বাতি আছে। যদিও ঝাড়বাতির চল এখন উঠে গেছে। নতুন কনসেপ্টে ড্রয়িংরুম হতে হবে সিম্পল, ঘরোয়া। ইংরেজি ভাষায় কমফর্টেবল এন্ড কোজি। আধুনিক ড্রয়িংরুমে দু'টার বেশি পেইন্টিং থাকবে না। এ বাড়িতে আছে কচুপাতার উপর শিশির।

তিনটা ফ্যামিলি ছবি থাকতে পারে। তিনটার বেশি কখনো না। এই ড্রয়িংরুমে তিনটাই আছে।

স্যার, আপনার চা।

শওকত তাকাল। বাবুর্চি টাইপ লোকটা শেষপর্যন্ত চা এনেছে। এককাপ চা। চায়ের সঙ্গে পিরিচ দিয়ে ঢাকা ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি। পানিটা যে খুবই ঠাণ্ডা সেটা বুঝা যাচ্ছে গ্লাসের গায়ে জমা বিন্দু বিন্দু পানির কণা দেখে। শওকতের এমনিতে কখনোই পানির তৃষ্ণা হয় না। শুধু ঠাণ্ডা পানির গ্লাস দেখলে প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়ে যায়। শওকত পানি খেতে খেতে বলল, আপনার নাম কী ?

লোকটি হাসিমুখে বলল, স্যার আমার নাম আকবর।

এই ড্রয়িংরুমে কি সিগারেট খাবার অনুমতি আছে ?

অবশ্যই আছে। আপনার কাছে সিগারেট আছে ? না-কি আনিয়ে দেব ?

সিগারেট-ম্যাচ সবই আমার সঙ্গে আছে। আমি যে এসেছি আপনার ম্যাডাম কি তা জানেন ?

জি জানেন। উনি গোসলে ঢুকেছেন বলে দেরি হচ্ছে। আপনি চা খেতে খেতে চলে আসবেন। স্যার, আপনাকে কি খবরের কাগজ দেব ?

দরকার নেই। এ বাড়িতে আপনার কাজটা কী ?

আমি কেয়ারটেকার। সব ধরনের কাজই কিছু কিছু করতে হয়।

আপনার ভাষা খুবই সুন্দর। দেশের বাড়ি কোথায় ?

যশোহর।

আপনি কি আমাকে আরেক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবেন ?

অবশ্যই পারব।

শওকত সিগারেট ধরাল। চায়ের কাপে চুমুক দিল। বড়লোকদের বাড়ির চা কেন জানি সবসময়ই কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। এই চা ঠাণ্ডা না, গরম এবং খেতেও ভালো। শওকত আবারো তাকাল কচুপাতার ছবির দিকে। আলো-ছায়ার খেলাটা এত সুন্দর এসেছে! এই শিল্পীকে মন খুলে অভিনন্দন জানাতে পারলে ভালো হতো। সেটা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ এই ছবি তারই আঁকা। নিজেকে নিজে ধন্যবাদ দেয়ার চল সমাজে নেই।

স্যার, আপনার পানি।

থ্যাংক য়্যু।

স্যার, আর কিছু লাগবে ?

না, আর কিছু লাগবে না।

চা আরেক কাপ দেই ?

না, থ্যাংক য়্যু।

আকবর নামের মানুষটা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। Uninteresting Face. এই চেহারার পোট্রেট করা যায় না। একটা সময় ছিল যখন নতুন কোনো মুখ দেখলেই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলত— এই মুখের পোট্রেট করা যায় কি যায় না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সে দু'ভাগে ভাগ করেছিল— Intersting Face, Uninteresting Face. Interesting Face-এর বাংলা কী হবে ? মজাদার চেহারা, না-কি আকর্ষণীয় চেহারা ? আকর্ষণীয় চেহারা অবশ্যই হবে না। অনেক চেহারা মোটেই আকর্ষণীয় না, কিন্তু খুবই interesting.

চা শেষ হয়ে আসছে। আকবরের কথানুসারে এর মধ্যেই তার ম্যাডামের চলে আসার কথা। হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসবে। তার ম্যাডামের নাম রেবেকা। শওকতের সঙ্গে বিয়ের পর নামের শেষে সে শওকতের 'শ' লাগাত। সে লিখত রেবেকা শ। নাম শুনলে মনে হতো বার্নাড শ'র ভাতিজি।

রেবেকার সঙ্গে তার বিয়ে মাত্র সাত বছর টিকেছে। আরো সূক্ষ্ম হিসাব করলে বলতে হয় বিয়ে টিকেছে ছয় বছর নয় মাস। তার বিবাহিত জীবন শেষ হলো ছয়-নয়ে। ছয়-নয়ের প্যাঁচ কঠিন প্যাঁচ।

শওকতের চা এবং সিগারেট দু'টাই এক সঙ্গে শেষ হয়েছে। আকবরের কথা শুনে আরেক কাপ চায়ের কথা বললে ভালো হতো। দ্বিতীয় কাপ চা এবং দ্বিতীয় সিগারেটের সঙ্গে কিছু অ্যাডভান্স চিন্তা করে রাখা। যেমন রেবেকা যখন ঘরে ঢুকবে সে তখন কী করবে ? সম্মান দেখানোর মতো উঠে দাঁড়াবে ? যে মেয়েটির সঙ্গে সে সাত বছর বিবাহিত জীবনযাপন করেছে, তাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর মধ্যে সামান্য হলেও কমেডি এলিমেন্ট আছে। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না। আবার গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা আরো হাস্যকর। রেবেকা এখন অন্য আরেকজনের স্ত্রী। সমাজের সম্মানিত মহিলা। তাকে সম্মান দেখানো দোষের কিছু না। শওকত যদি কাঠের গুঁড়ির মতো বসে থাকে, তাহলে রেবেকা হয়তো ভুরু কুঁচকে বিরক্তি বিরক্তি ভাব নিয়ে তাকাবে। কিন্তু শওকত যদি অতি বিনয়ী হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তাহলে রেবেকা কিছুটা লজ্জা পাবে। লজ্জা পুরোপুরি কাটার আগেই শওকত বলবে, রেবেকা কেমন আছ ? আবেগবর্জিত স্বাভাবিক সৌজন্যমূলক প্রশ্ন।

রেবেকা বলবে, ভালো।

তারপরই শওকত আরো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবে, মিস্টার অ্যান্ডারসন কেমন আছেন ?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রেবেকা একটু হলেও থতমত খাবে। আগের স্বামীর মুখে বর্তমান স্বামীবিষয়ক প্রশ্ন কোনো মেয়েরই সহজভাবে নেবার কথা না।

সরি, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

রেবেকা পেছন দিক থেকে কখন ঘরে ঢুকেছে শওকত বুঝতেই পারে নি। সে চট করে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সামনের টেবিলের কোনায় হাঁটুর খোঁচা লাগল। পিরিচে রাখা চায়ের কাপটা পিরিচে পড়ে কাত হয়ে পড়ে গেল। কাপে চা ছিল না। চা থাকলে চা গড়িয়ে বিশ্রী কাণ্ড হতো।

শওকত বলল, কেমন আছ রেবেকা ?

রেবেকা বসতে বসতে বলল, ভালো আছি।

শওকতের এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটা করার কথা। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার রেবেকার স্বামীর নাম এখন আর মনে পড়ছে না। শওকত নিশ্চয়ই বলতে পারে না, রেবেকা, তোমার আমেরিকান স্বামী কেমন আছেন ? শওকতের স্মৃতিশক্তি দুর্বল না, রেবেকার স্বামীর নাম সে জানে। নিউজার্সিতে এই ভদ্রলোকের পুরনো বইয়ের একটা দোকান আছে। দোকানের নাম All gone! বাংলা করলে হয় 'সব চলে গেছে'। ভদ্রলোক এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসথেটিকস পড়াতেন। রেবেকার সঙ্গে সেখানেই তার পরিচয়। ছাত্র পড়াতে ভালো লাগে না বলে তিনি পুরনো বইয়ের দোকান দিয়েছেন। তাঁর এখন সময় কাটছে পুরনো বই পড়ে। শওকতের সব কিছু মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের নামটা শুধু মনে পড়ছে না। তার সাময়িক ব্ল্যাক আউট হয়েছে।

রেবেকা বলল, তোমার কি শরীর খারাপ না-কি ?

শওকত বলল, না তো!

রেবেকা বলল, কেমন কপাল টপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছ।

একটা কথা মনে করার চেষ্টা করছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না।

রেবেকা বলল, চেষ্টা বেশি করলে মনে পড়বে না। রিলাক্সড থাক। মনে পড়বে।

শওকত এই প্রথম রেবেকার দিকে তাকাল। যেসব বাঙালি মেয়ে দেশের বাইরে থাকে তাদের চেহারায় আলগা এক ধরনের লালিত্য দেখা যায়। গায়ের রঙও হয় উজ্জ্বল; রেবেকাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার বয়স কমে গেছে। চেহারায় কেমন যেন বিদেশিনী বিদেশিনী ভাব চলে এসেছে। এরকম হয়েছে চুলের কারণে। রেবেকার চুল ছিল লম্বা এবং কোঁকড়ানো। কোঁকড়ানো

ভাব এখন আর নেই। চুল কেটে সে ছোটও করেছে। তবে এতে তাকে দেখতে খারাপ লাগছে না। বরং আগের চেয়েও সুন্দর লাগছে।

শওকত বলল, তুমি আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছ।

রেবেকা বলল, থ্যাংক য়্যু।

শওকত বলল, মিস্টার অ্যান্ডারসন কেমন আছেন ?

বলেই সে খুব তৃপ্তি বোধ করল। নামটা শেষপর্যন্ত মনে পড়েছে।

রেবেকা বলল, সে ভালো আছে। এই নামটাই কি তুমি মনে করার চেষ্টা করছিলে ?

শওকত বলল, হ্যাঁ।

রেবেকা বলল, চা খাবে ?

চা একবার খেয়েছি।

আরেকবার খাও। আমি সকালে কোনো নাশতা করি না। এক কাপ চা আরেকটা টোস্ট বিস্কিট খাই। আজ এখনো খাওয়া হয় নি। তোমার সঙ্গে খাব বলে অপেক্ষা করছিলাম।

চা দিতে বলো।

তুমি নাশতা খেয়ে এসেছ ?

হ্যাঁ।

কী নাশতা করলে ?

পরোটা আর বুটের ডাল।

রেস্টুরেন্টের রান্না ?

হ্যাঁ।

খাওয়া-দাওয়া কি সব হোটেল থেকে আসে ?

একবেলা ঘরে রান্না হয়।

একবেলাটা কখন ?

রাতে।

কে রাঁধে ?

আমি নিজেই রাঁধি। ভাত ডিম ভাজি ডাল। সিম্পল ফুড।

বাসায় কাজের কোনো লোক নেই ?

একজন ছিল। মায়ের অসুখ বলে দেশে গিয়েছিল, আর ফেরে নি।

রেবেকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি চায়ের কথা বলে আসি। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে ?

না।

তোমাকে অতি ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন যে করলাম, তার পেছনে কারণ আছে। তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার এখন আগ্রহ দেখানোর কিছু নেই।

কারণটা কী ?

আমি দেশে এসেছি পনের দিনের জন্য। সঙ্গে করে ইমনকে নিয়ে এসেছি। সে তার এবারের জন্মদিন তোমার সঙ্গে করতে চায়। আমি ঠিক করেছি চার-পাঁচদিন একনাগাড়ে তাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেব।

আমার কথা কি তার মনে আছে ?

মনে থাকবে না কেন ? তোমার সঙ্গে যখন আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তখন ইমনের বয়স পাঁচ বছর তিন মাস। চার বছর থেকেই শিশুদের সব স্মৃতি থাকে।

ইমন কোথায় ?

সে তার নানুর কাছে গিয়েছে। তার শরীরটা ভালো না।

কী হয়েছে ?

জ্বর বমি এইসব। দেশের ওয়েদার তাকে স্যুট করছে না।

শওকত আগ্রহ নিয়ে বলল, ইমনকে কবে নিয়ে যাব ?

রেবেকা বলল, ওর জন্মদিন কবে তোমার কি মনে আছে ?

না। ভুলে গেছি।

আমারো তাই ধারণা। ওর জন্মদিন এই মাসের নয় তারিখ। তুমি পাঁচ তারিখ এসে ওকে নিয়ে যাবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চা নিয়ে আসছি।

ড্রয়িংরুমে শওকত এখন একা। সে আগেও একা বসেছিল, তখন নিজেকে একা একা মনে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে। সবচে' বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে রেবেকা যখন বলল, আমি সঙ্গে করে ইমনকে নিয়ে এসেছি, তখন সে বুঝতেই পারে নি ইমনটা কে ? যখন বুঝতে পারল তখন হঠাৎ সব জট পাকিয়ে গেল। সে ভুলে গেল এই মাসের নয় তারিখে ইমনের জন্মদিন। সে কখনো এই দিন ভুল করে না। ঐ দিন সে একটা সাদা ক্যানভাসে মনের সুখে হলুদ রঙে মাখায় লেমন ইয়েলো। কারণ শওকত তার ছেলের নাম রেখেছিল 'লেমন ইয়েলো'। রঙের নামে নাম। ছেলের জন্ম হলো মিডফোর্ট হাসপাতালে। ছেলেকে দেখে সে

বিস্মিত হয়ে বলেছিল— একী! এই ছেলে দেখি সন্ধ্যার আকাশের সমস্ত লেমন ইয়েলো রঙ নিয়ে চলে এসেছে। আমি এই ছেলের নাম রাখলাম লেমন ইয়েলো!

লেমন ইয়েলো দেশে এসেছে। সে তার বাবার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে।

রেবেকা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। শওকত আবারো উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার উঠে না দাঁড়ালেও চলত। কেন দাঁড়াল সে নিজেও জানে না।

রেবেকা বলল, তুমি এখন কী করছ?

শওকত বলল, একটা ডেইলি পেপারে ইলাস্ট্রেশন করি। আর দু'টা ম্যাগাজিনে পার্ট টাইম ইলাস্ট্রেশন করি। বইমেলার সময় বইয়ের কাভার করি। সেট ডিজাইন করি।

তোমার চলে যায়?

হুঁ। দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। মা মারা গেছেন। আমার নিজের তো আর টাকা বেশি লাগে না।

তোমার মা'র মৃত্যু তাহলে তোমার জন্যে একটা রিলিফের মতো হয়েছে। প্রতি মাসে টাকা পাঠাতে হবে এই টেনশন নেই।

শওকত ক্ষীণ স্বরে বলল, ঠিকই বলেছ।

রেবেকা বলল, যে কয়দিন ইমনকে রাখবে তার খাওয়া-দাওয়ার দিকে লক্ষ রাখবে। হোটেলের কোনো খাবার বা ফাস্ট ফুড খাওয়াবে না। খাওয়া নিয়ে সে মোটেও যন্ত্রণা করে না। এক গ্লাস দুধ, এক পিস পাউরুটি, একটা হাফ বয়েলড ডিম হলেই তার হয়।

তুমি চিন্তা করো না, আমি বাইরের খাবার খাওয়াব না।

ছবি আঁকাআঁকি কি বন্ধ?

বন্ধই বলা চলে।

ছবি আঁকছ না কেন?

ইচ্ছা করে না।

ছেলেকে যখন কাছে নিয়ে রাখবে, তখন একটা দু'টা ছবি আঁকার চেষ্টা করবে। ইমন তার বাবার ছবি আঁকা নিয়ে খুব একসাইটেড।

ও আচ্ছা।

ফাদারস ডে-তে তাদের স্কুলে বাবাকে নিয়ে রচনা লিখতে বলা হয়েছিল। ইমন একটা দীর্ঘ রচনা লিখেছে। রচনার শিরোনাম হচ্ছে My Painter Father.

বলো কী ?

আমি তার রচনাটার ফটোকপি নিয়ে এসেছি। তোমাকে দিয়ে দেব। এটা পড়া থাকলে ছেলে তার বাবা সম্পর্কে কী ভাবছে তা তোমার জানতে সুবিধা হবে। আমি চাই এই অল্প কয়েকটা দিন ইমন যেন আনন্দে থাকে।

আমি চেষ্টা করব। ইমনকে নিতে কবে আসব ?

আগেই তো বলেছি, পাঁচ তারিখে চলে এসো।

এখন তাহলে উঠি ?

এক মিনিট দাঁড়াও, ইমনের লেখা এসেটা তোমাকে দিচ্ছি। ইমন যেন জানতে না পারে, সে লজ্জা পাবে।

ওকে কিছু বলব না।

একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি— রাতে কিন্তু সে অন্ধকার ঘরে ঘুমুতে পারে না। অবশ্যই ঘরে বাতি জ্বালিয়ে রাখবে।

হ্যাঁ রাখব।

তোমার বাসায় কি এসি আছে ?

না।

এখন অবশ্য গরম সেরকম না। ঠিক আছে, তুমি যে অবস্থায় থাক ছেলে সেই অবস্থাটাই দেখুক। তার জন্যে আলাদা কিছু করতে হবে না।

ইমনের লেখা ইংরেজি রচনার বাংলাটা এরকম—

আমার পেইন্টার বাবা

আমার বাবা থাকেন বাংলাদেশে। সেখানের সবচে' বড় শহরটার নাম ঢাকা। তিনি ঢাকায় থাকেন এবং দিনরাত ছবি আঁকেন। গাছপালার ছবি, নদীর ছবি এইসব। তিনি গাছপালার ছবি বেশি আঁকেন কারণ বাংলাদেশে অনেক গাছ। পুরো দেশটা সবুজ। এই জন্যেই বাংলাদেশের পতাকার রঙও সবুজ। সবুজের মাঝখানে লাল সূর্য আঁকা।

আমার বাবাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তিনি আমাকে পছন্দ করেন কি-না আমি জানি না। মনে হয় করেন না। কারণ তিনি কখনোই আমার বার্থডেতে কোনো কার্ড পাঠান

নি। এই নিয়ে আমি মোটেও মন খারাপ করি না। কারণ তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে দিন-রাত ছবি আঁকতে হয়।

আমি আমার বাবাকে তিনটা কার্ড পাঠিয়েছি। তিনটা কার্ডের ছবি আমি নিজে এঁকেছি। একটাতে ছিল ক্রিসমাস ট্রি। আরেকটা ছবিতে আমি মাছ মারতে লেক ইওনিতে গিয়েছি। অন্য কার্ডটা শুধু ডিজাইন। কার্ডগুলো পাঠাতে আমার খুবই লজ্জা লাগছিল। কারণ, আমার বাবা কত ভালো ছবি আঁকেন। আর আমি তো ছবি আঁকতেই পারি না। আমি যখন রঙ দেই, তখন একটা রঙের সঙ্গে আরেকটা রঙ মিশে কেমন যেন হয়ে যায়। যদি কখনো বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাহলে আমি তাঁর কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখব।

আমার আঁকা তিনটা কার্ডের কোনোটাই শেষপর্যন্ত বাবাকে পাঠানো হয় নি, কারণ আমার মা বাবার ঠিকানা জানতেন না। মা'র কোনো দোষ নেই, কারণ বাবার স্বভাব হচ্ছে দু'দিন পর পর বাড়ি বদলানো। বড় বড় শিল্পীরা এরকমই হয়। ভ্যানগঁগ নামের শিল্পীর কোনো বাড়ি-ঘরই ছিল না। আমাদের আর্ট টিচার মিস সুরেনসন বলেছেন— ভ্যানগঁগ তার প্রেমিকাকে নিজের কান কেটে উপহার দিয়েছিলেন। আমি মনে মনে খুব হেসেছি। কাটা কান কি কাউকে উপহার হিসেবে দেয়া যায়? আমি শব্দ করে হাসি নি কারণ শব্দ করে হাসলে মিস সুরেনসন রাগ করেন।

রাগ করলেও আমাদের সবার উচিত শব্দ করে হাসা এবং শব্দ করে কাঁদা। কারণ তাতে আমাদের লাংস পরিষ্কার থাকে। এই কথাটা আমাদেরকে বলেছেন আমাদের গেম টিচার। আমি যদিও কোনো গেম পারি না, তারপরেও আমি গেম টিচারকে খুব পছন্দ করি। তাঁকে সবাই ডাকে কনি। কিন্তু তাঁর নাম রিচার্ড বে হাফ। আমি গেম টিচারকে আমার বাবার কথা বলেছি। তিনি বলেছেন— তোমার বাবা তো একজন অতি ভালোমানুষ। তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

দেখা করা সম্ভব না। কারণ বাবা তো আর আমেরিকায় থাকেন না। বাবা যদি আমেরিকায় থাকতেন তাহলে আমি অবশ্যই বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিতাম। বাবাকে বলতাম, তুমি মিস্টার কনির একটা পোট্রেট এঁকে দাও। পোট্রেট করার সময় তার গালের কাটা দাগটা মুছে দিও। এই কাটা দাগটা উনি পছন্দ করেন না।

মিস্টার কনি আমাকে বলেছেন বাবা-মা'র ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা নিয়ে কখনো মন খারাপ করতে নেই। তুমি দূর থেকে তোমার বাবাকে ভালোবাসবে। তোমার বাবাও দূর থেকে তোমাকে ভালোবাসবেন। যখন তোমাদের দেখা হবে তখন দেখবে তোমার এবং তোমার বাবার ভালোবাসার মধ্যে রেসলিং শুরু হবে। সব রেসলিং-এ একজন হারে একজন জিতে। এই রেসলিং-এ দু'জনই জিতবে।

মিস্টার কনি এত মজার মজার কথা বলেন! মজা করে কথা বললেও তিনি আসলে খুবই জ্ঞানী।

শওকত তার ছেলের লেখা রচনা অতি দ্রুত একবার শেষ করে দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু করল। প্রথমবার পড়তে কোনো সমস্যা হয় নি, দ্বিতীয়বার পড়তে খুব কষ্ট হলো। এক একটা লাইন পড়ে, চিঠি ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে থাকে।

কোনো পরিবারে একজন কেউ কানে কম শুনলে বাকি সবাই জোরে কথা বলে। আনিকাদের বাড়ির কেউই কানে কম শোনে না, তারপরেও সবাই জোরে কথা বলে। মনে হয় এ বাড়ির লোকজন সবাই সারাক্ষণ ঝগড়া করছে।

শওকত আনিকার কাছে এসেছে। সে বসেছে বারান্দায় পেতে রাখা চৌকিতে। কলাবাগানে মোটামুটি আধুনিক একটি ফ্ল্যাটবাড়ির বারান্দায় তোষকবিহীন চৌকি পেতে রাখা সাহসের ব্যাপার। আনিকাদের সে সাহস আছে। চৌকিটা বাড়তি বিছানা হিসেবে কাজ করে। হঠাৎ কোনো অতিথি এসে পড়লে চৌকিতে ঘুমুতে দেয়া হয়। পরিবারের কোনো সদস্য রাগ করলে এই চৌকিতে ঝিম ধরে বসে থাকে। আনিকা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাদের এই চৌকিটার নাম 'রাগ-চৌকি'। তুমি যদি কখনো রাত দু'টা-তিনটার সময় আসো, তাহলে দেখবে কেউ না কেউ রাগ করে চৌকিতে বসে আছে। শওকত বলেছিল, দু'জন যদি একসঙ্গে রাগ করে, তখন কী হয় ? দু'জন পাশাপাশি বসে থাকে ?

আনিকা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার কি ধারণা বাড়িতে আমরা সব সময় ঝগড়া করি ? আমাদের সম্পর্কে তোমার এত খারাপ ধারণা ?

তাদের সম্পর্কে শওকতের ধারণা খুব যে উঁচু তা না। আজ শুক্রবার ছুটির দিন। ছুটির দিনে সবার মন-মেজাজ ফুরফুরে থাকার কথা। অথচ শওকত আধঘণ্টা বসে থেকে চড়-থাপ্পড়ের শব্দ শুনেছে। কান্নার শব্দ শুনেছে। আনিকার বাবার গর্জন কিছুক্ষণ পরপরই শোনা যাচ্ছে— আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব! আমি অবশ্যই তোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব! যাকে পুঁতে ফেলার কথা বলা হচ্ছে, তার নাম মিতু। আনিকার ছোটবোন। মিতু এবার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবে। গত পরশু রাতে সে বাসায় ফিরে নি। বান্ধবীর জন্মদিনের কথা বলে বান্ধবীর বাসায় থেকে গেছে। পরদিন জানা গেছে বান্ধবীর জন্মদিন ছিল না। বান্ধবীর বাসায় মিতু থাকে নি।

অপরাধ অবশ্যই গুরুতর। শওকত অবাক হয়ে দেখল, কিছুক্ষণের মধ্যে সব স্বাভাবিক। আনিকার বাবা মতিয়ুর রহমান টিভি ছেড়েছেন। সেখানে তারা চ্যানেলে উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখাচ্ছে। তিনি আগ্রহ নিয়ে স্ত্রীকে ছবি দেখার জন্যে ডাকছেন। এই ভদ্রলোক একা কোনো ছবি দেখতে পারেন না। ছবি দেখার সময় তার আশেপাশে সবসময় কাউকে না কাউকে লাগে। এক সময় দর্শকের সন্ধানে তিনি বারান্দায় উঁকি দিয়ে শওকতকে দেখে বললেন, তুমি কখন এসেছ ?

শওকত উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বেশিক্ষণ হয় নি।

তুমি চুপি চুপি বারান্দায় এসে বসে থাকবে— এটা কেমন কথা! তোমাকে চা-টা দিয়েছে ?

জি।

আনিকার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

জি দেখা হয়েছে। ও আমাকে নিয়ে কোথায় যেন যাবে— এই জন্যে খবর দিয়েছে। মনে হয় তৈরি হচ্ছে।

মতিয়ুর রহমান বললেন, মেয়েদের তৈরি হওয়া তো সহজ ব্যাপার না। ঘণ্টা দুই লাগবে। এই ফাঁকে এসো একটা ছবি দেখে ফেলি। উত্তম-সুচিত্রার ছবি। আগে দেখছ নিশ্চয়ই। সাগরিকা।

চাচা, ছবি দেখব না।

কিছুক্ষণ দেখ। একা ছবি দেখে মজা নাই। আনিকার সাজ শেষ করে বের হতে দেরি আছে। আমার মেয়েদের আমি চিনি না! এদেরকে হাড় মাংসে চিনি।

শওকত ছবি দেখতে বসল। মতিয়ুর রহমান ছবি দেখতে দেখতে ক্রমাগত কথা বলতে থাকলেন।

মিতুর ঘটনা শুনেছ ?

জি-না।

অতি হারামি মেয়ে। বান্ধবীর জন্মদিন। রাতে বান্ধবীর সঙ্গে না থাকলে বান্ধবী না-কি কাঁদতে কাঁদতে মরেই যাবে। তারপর কী হয়েছে শোন। কাজী নজরুলের কবিতা— পড়বি পর মালীর ঘাড়ে/ সে ছিল গাছের আড়ে। সেই বান্ধবী সকালে বাসায় উপস্থিত। আমি বললাম, মা, জন্মদিন কেমন হলো ? সেই মেয়ে অবাক হয়ে বলল, কিসের জন্মদিন চাচা ? এইদিকে মিতু আবার চোখ ইশারা করতে করতে বলছে— তোর জন্মদিনের কথা হচ্ছে। ঐ যে কালরাত সবাই মিলে তোর বাসায় সারারাত হৈচৈ করলাম। মিতুর বান্ধবী গেল আরো

হকচকিয়ে। সে একবার আমার দিকে তাকায়, একবার মিতুর দিকে তাকায়। বুঝেছ শওকত, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনো কিছুই ঠিকমতো পারে না। একটা মিথ্যা পর্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারে না। মিতুকে প্রিলিমিনারি একটা কঁ্যাচা দিয়েছি। রাতে আরো একডোজ ওষুধ পড়বে। তার খবর আছে।

উত্তম-সুচিত্রার 'সাগরিকা' অনেকখানি দেখে শওকত বের হলো। আনিকা মোটামুটি কঠিন টাইপ সাজ করেছে। তাকে দেখে শওকতের মায়া লাগছে। সাজলে এই মেয়েটাকে ভালো লাগে না। কোনোরকম সাজসজ্জা ছাড়া সে যখন সাধারণভাবে থাকে, তখন তার চেহারায় মিষ্টি মায়া ভাব থাকে। সাজলে সেটা থাকে না। চেহারা রুক্ষ হয়ে যায়। বয়স্ক মা-খালা ধরনের মহিলা মনে হয়। আনিকার এমন কিছু বয়স হয় নি। ত্রিশ বছর অবশ্যি হয়ে গেছে। একটি কুমারী মেয়ের ত্রিশ বছর তেমন বয়স না। অথচ এই মেয়েটাকে দেখে মনে হয় দ্রুত তার বয়স বাড়ছে। মাথার চুল পড়তে শুরু করেছে।

শওকত বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আনিকা বলল, আমার সাজসজ্জা দেখে বুঝতে পারছ না কোথায় যাচ্ছি?

না, বুঝতে পারছি না।

আমার সাজ কেমন হয়েছে?

খারাপ না— একটু শুধু কটকটা হয়েছে।

কটকটা মানে কী?

হাওয়াই মিঠাই টাইপ।

আনিকা আহত গলায় বলল, আমি যত সুন্দর করেই সাজি না কেন— তুমি সবসময় বলো, কটকটা। তুমি কি চাও আমি বিধবাদের কাপড় পরি? সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ?

তোমার যা পছন্দ তাই পরবে।

আনিকা বলল, আজ রিকশায় উঠব না। এসি আছে এমন কোনো ইয়োলো ক্যাব নাও।

শওকত বলল, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আনিকা বলল, মগবাজারে যাচ্ছি।

কোনো বিয়ের দাওয়াত?

আনিকা কঠিন গলায় বলল, বিয়ের দাওয়াত-ফাওয়াত না। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। মগবাজার কাজি অফিসে যাব।

শওকত বলল, ঠাট্টা করছ?

আনিকা বলল, ঠাট্টা করব কেন ? তুমি তো জানো আমি ঠাট্টা করার মেয়ে না। তোমার পাল্লায় পড়ে আমি অনেক দিন ঘুরেছি। আমার আর ভালো লাগছে না। হয় তুমি আজকে আমাকে বিয়ে করবে; আর যদি তা না হয়, বিয়ে করতে কখনো বলব না। আমার নিজেকে সিন্দাবাদের ভূত বলে মনে হয়। তোমার ঘাড়ে চেপে আছি। তুমি যতই ফেলতে চাচ্ছ, আমি ততই ক্যাঁচকি মেরে বসছি।

শওকত হাসল। আনিকা বলল, এভাবে হাসবে না। আমি হাসির কোনো কথা বলছি না। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ট্যাক্সি আন। এসি আছে এমন গাড়ি আনবে। আজ কেন জানি আমার খুব গরম লাগছে। হাঁসফাঁস লাগছে।

ট্যাক্সিতে উঠে আনিকা সত্যি সত্যি ট্যাক্সিওয়ালাকে বলল, মগবাজার যাবেন ? মগবাজার কাজি অফিস। চিনেন না ?

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, চিনি।

আনিকা বলল, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা আপনার ট্যাক্সিটা ভাড়া করতে চাই। ঘণ্টায় এত রেট— এ ধরনের ফালতু অ্যারেঞ্জমেন্টে আমি যাব না। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত থাকবেন। কত নিবেন বলেন। প্যাকেজ ডিল।

এক হাজার টাকা দেন।

পাঁচশ' পাবেন। চিন্তা করে দেখেন। বখশিশ আলাদা দেব। এক্ষুণি জবাব দিতে হবে না। মগবাজার কাজি অফিসে যেতে যেতে চিন্তা করেন।

শওকত বলল, আমরা কি সত্যি সত্যি কাজি অফিসে যাচ্ছি ?

আনিকা ক্লান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ। তোমার কি অসুবিধা আছে ? বিয়ের কথা তো অনেক দিন থেকেই বলছ। সামনের বছর বিয়ে। এই শীতে না, পরের শীতে। এই করে করে সাত বছর পার করেছ। আর কত ?

শওকত বলল, একটা সিগারেট ধরাই ?

ধরাও। ড্রাইভার সাহেব গাড়ির কাচ নামিয়ে দিন। আর আপনি চিন্তা-ভাবনা করছেন তো ? আমি আরো একশ' বাড়িয়ে দিলাম। ছয়শ'।

শওকত সিগারেট টানছে। তারা কাজি অফিসে যাচ্ছে— এই নিয়ে সে খুব যে চিন্তিত তা না। এক্ষুণি বিয়ে করতে হবে— এরকম একটা ঝোঁকের ভেতর দিয়ে আনিকা প্রায়ই যায়। ঝোঁক কেটেও যায়। আজকেও নিশ্চয়ই সে-রকম কিছু হবে। তবে ট্যাক্সি নিয়ে কাজি অফিসের দিকে রওনা দেয়াটা বাড়াবাড়ি। একে ঝোঁক বলা ঠিক হচ্ছে না।

আনিকা বলল, তুমি কথা বলছ না কেন ?

চিন্তা করছি।

আজ বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার আপত্তি আছে ? আজ শুভদিন। শুক্রবার। অক্টোবরের তিন তারিখ। ১৩ আশ্বিন।

শওকত বলল, বিয়ের মতো বড় ব্যাপারে প্রিপারেশন লাগবে না ?

আনিকা বলল, তুমি তো সাত বছর ধরেই প্রিপারেশন নিচ্ছ। আরো প্রিপারেশন লাগবে ?

শওকত বলল, বিয়ের পর তুমি কি আমার এখানে উঠবে ?

আনিকা বলল, তোমার বাসায় আমি কীভাবে উঠব ? বাবার এক পয়সা রোজগার নেই। পুরো সংসার চলছে আমার টাকায়।

শওকত বলল, তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে— বিয়ের পর তুমি তোমার বাসায় থাকবে। আমি আমার বাসায়।

আনিকা বলল, তুমি আমার বাসায় উঠে আসবে। আমি একটা আলাদা ঘর নিয়ে থাকি— তুমি আমার ঘরে থাকবে। কিছুদিন পর মিতুর বিয়ে হয়ে যাবে। তখন মিতুর ঘরটায় তুমি তোমার ছবি আঁকার জিনিসপত্র রাখবে।

ঘরজামাই হবো ?

আমরা মেয়েরা যদি ঘরবউ হতে পারি, তোমাদের ঘরজামাই হতে অসুবিধা কী ?

কোনো অসুবিধা নেই।

সিগারেট তো শেষ হয়ে গেছে, হাতে নিয়ে বসে আছ কেন ?

শওকত সিগারেট ফেলে দিতে দিতে বলল, তোমাকে একটা খবর দিতে চাচ্ছি।

কী খবর দেবে ?

আমার ছেলে এসেছে ঢাকায়। সে কয়েক দিন আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সঙ্গে জন্মদিন করবে।

ছেলে নিশ্চয়ই একা আসে নি। ছেলের মাও এসেছেন। তিনিও কি ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে তোমার সঙ্গে থাকবেন ?

ছেলের মা অন্য একজনের স্ত্রী।

তাতে কী হয়েছে ? পাকা রঙ এত সহজে যায় না। বাবা-মা দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছেলে জন্মদিনের কেক কাটবে। বাবা-মা একসঙ্গে সুর করে গাইবে— হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। তারপর তারা নিজেদের দিকে তাকিয়ে লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতে হাসবে। সেই হাসির ছবি তোলা হবে।

ট্যাক্সি মগবাজার কাজি অফিসের সামনে থামল। ড্রাইভার জানাল সে ছয়শ' টাকাতে রাজি আছে। শুধু বখশিশের পরিমাণ যেন বাড়িয়ে দেয়া হয়।

আনিকা বলল, বখশিশ নির্ভর করবে ভালো ব্যবহারের উপর। আপনি মাই ডিয়ার ব্যবহার করবেন, আমি আপনার বখশিশ বাড়িয়ে দেব। এখন আপনি যান, এককাপ চা খেয়ে আসুন। গাড়ি চালু রেখে যান। আপনার ঠাণ্ডা গাড়িতে বসে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ ঝগড়া করব। আমাদের ঝগড়া আপনাকে শোনাতে চাই না।

শওকত গাড়ির সিটে গা এলিয়ে দিতে দিতে বলল, করো ঝগড়া করো।

আনিকা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, থাক ঝগড়া করব না। তোমার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে আজ থেকে আমি একজন সেকেন্ডহ্যান্ড হাজবেন্ডের সন্ধানে বের হবো।

সেকেন্ডহ্যান্ড ?

আনিকা বলল, অবশ্যই সেকেন্ডহ্যান্ড। আমার কপাল হলো সেকেন্ডহ্যান্ডের। আমার যখন সতেরো বছর বয়স, তখন বিয়ের যে প্রপোজল এলো সেই পাত্র সেকেন্ডহ্যান্ড। স্ত্রী মারা গেছে। বিরাট বড়লোক। তুমি চিন্তাই করতে পারবে না সেই সেকেন্ডহ্যান্ডওয়ালার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে সবার সে কী চাপাচাপি! তারপর আরেকটা প্রপোজল এলো। ছেলে ইতালিতে থাকে। বিয়ে যখন প্রায় হয় হয় অবস্থা, তখন জানা গেল— ছেলে কাগজপত্রের জন্যে জার্মান এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এক বছর তারা ছিল এক সঙ্গে। সেই পাত্রও বাবার পছন্দ। বাবা বললেন, প্রয়োজনে সে জার্মান বিয়ে করেছে। শখের বিয়ে তো না। সমস্যা কী ? শেষমেষ সেকেন্ডহ্যান্ড আধবুড়ো তুমি উদয় হলে। আমি বুড়োর প্রেমে হাবুডুবু— ও আমার জানরে, ও আমার পাখিরে অবস্থা।

শওকত বলল, আনিকা তোমার কি জ্বর না-কি ?

আনিকা বলল, আমার কথাবার্তা কি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার মতো শোনাচ্ছে ?

চোখ লাল, এই জন্যে বলছি।

গায়ে হাত দিয়ে দেখ জ্বর কি-না। তোমার সঙ্গে আমি যে আচরণ করি, তা মোটামুটি বেশ্যামেয়েদের মতোই। বেশ্যামেয়ের গায়ে যে-কোনো সময় হাত দেয়া যায়।

শওকত বলল, তোমার জ্বর। বেশ ভালো জ্বর। বাসায় যাও। বাসায় গিয়ে শুয়ে থাক।

আনিকা বলল, আমি ছ'টা পর্যন্ত ক্যাব ভাড়া করেছি। ছ'টা পর্যন্ত ক্যাব নিয়ে ঘুরব। একা একা ঘুরব।

একা একা ?

দোকা কোথায় পাব ? একা একাই ঘুরব। বাসায় আমি ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারি না। মাঝে মাঝে বাইরে বের হই নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। এখন তুমি যদি কিছু মনে না কর, তোমাকে একটা অনুরোধ করব।

করো অনুরোধ।

গাড়ি থেকে নেমে যাও। আমি চাচ্ছি না তুমি আমার সঙ্গে থাক।

ছটা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকতে আমার কোনো সমস্যা নেই। তুমি জানো আমি এমন কোনো ব্যস্ত মানুষ না।

আনিকা বলল, তোমার সমস্যা না থাকলেও আমার আছে। প্লিজ নেমে যাও।

শওকত গাড়ি থেকে নেমে গেল।

ড্রাইভার বলল, আপা কোথায় যাব ?

আনিকা বলল, আমার শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ। আমাকে বারবার প্রশ্ন করে বিরক্ত করবেন না। আপনাকে তো বলেছি সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে ঘুরবেন।

শহরের বাইরে যাব আপা ?

বাইরে মানে কোথায় ?

গাজীপুর শালবন। কিংবা বিশ্বরোড ধরে কুমিল্লার দিকে যেতে পারি।

শহরের ভেতর ঘুরতে আপনার অসুবিধা কী ?

কোনো অসুবিধা নেই। শহরের ভেতরে যানজট। গাড়ি নিয়ে বসে থাকতে হয়।

আপনার যেখানে ইচ্ছা যান। ছটার সময় বাসায় পৌঁছলেই হবে। আমার বাসা কলাবাগানে।

আনিকা চোখ বন্ধ করল। তার শরীর হঠাৎ করেই বেশ খারাপ করছে। বুকের ভেতর ধ্বক ধ্বক শব্দ। নিঃশ্বাসে কষ্ট। নিঃশ্বাসের এই কষ্ট যখন হয়, তখন খুব পানির তৃষ্ণা হয় অথচ পানি খেতে গেলে বমির মতো আসে। আনিকার ধারণা তার বড় ধরনের কোনো হার্টের অসুখ হয়েছে। মেয়েদের জন্যে হার্টের অসুখ খুব খারাপ। হার্ট দুর্বল মেয়েরা বাচ্চা নিতে পারে না। আনিকার এক বান্ধবীর (শারমিন) হার্টের অসুখ ছিল। ডাক্তাররা তাকে বাচ্চা নিতে নিষেধ

করে দিয়েছিলেন। শারমিন এখন অস্ট্রেলিয়াতে। সেখানে তার বাচ্চা হয়েছে কি-না কে জানে! হবার কথা। অস্ট্রেলিয়ায় বড় বড় ডাক্তার আছে। তারা নিশ্চয়ই শারমিনের হার্ট ঠিক করে ফেলেছে।

আনিকার খুব বাচ্চার শখ। শখটা বাড়াবাড়ি রকমের বলেই তার ধারণা এই শখ কোনোদিন মিটবে না। এই পর্যন্ত তার একটি শখও মিটে নি। বড় বড় শখ তো অনেক পরের ব্যাপার, ছোটখাটো শখও মিটে নি। স্কুল থেকে একবার ঠিক করা হলো সবাই মিলে ময়নামতিতে যাবে। বেশি দূর তো না। ঢাকা থেকে দু'ঘণ্টা মাত্র লাগে। সে সত্তর টাকা চাঁদাও দিয়েছিল। যেদিন যাবার কথা, তার আগের রাতে উত্তেজনায় সে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে নি। সারারাত ধরে উল্টাপাল্টা স্বপ্ন। যেমন সে কাপড় খুঁজে পাচ্ছে না। সকাল ন'টার মধ্যে স্কুলে উপস্থিত হবার কথা। ন'টা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। যখন অতি সাধারণ একটা জামা পরে বের হলো, তখন ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। সে স্কুলে যাবার জন্যে কোনো রিকশা পাচ্ছে না। কারণ সেদিনই রিকশা হরতাল দেয়া হয়েছে। গাড়ি ঠিকই চলছে, শুধু রিকশা নেই।

ময়নামতি যাওয়া শেষপর্যন্ত হয় নি। আনিকার বাবা সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হুঙ্কার দিলেন— কিসের শিক্ষা সফর! এইসব ফাজলামি আমি জানি। শিক্ষা সফরের নামে যেটা হয়, তাকে বলে কুশিক্ষা সফর। কোথাও যেতে হবে না। ঘরে বসে টিভি দেখ।

সামান্য ময়নামতি যাবার শখ যেখানে মেটে না, সেখানে নিজের বাচ্চা কোলে নিয়ে আদর করার শখও তার মিটবে না। অথচ সে বাচ্চার নাম পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে। ডাক নাম। ভালো নাম রাখবে ছেলের বাবা। ডাক নাম হচ্ছে— ছেলে হলে 'ক'। মেয়ে হলে 'আ'। কেউ যখন ছেলেকে জিজ্ঞেস করবে, বাবা, তোমার নাম কী ? ছেলে গাল ফুলিয়ে বলবে, আমার নাম ক ?

তোমার নাম 'ক' ? শুধু 'ক' ?

হ্যাঁ।

এই নাম কে রেখেছে ?

আমার মা রেখেছেন।

তোমার কি আরো ভাইবোন আছে ?

আমরা তিন ভাইবোন। আমার আরো দু'টা বোন আছে।

ওদের নাম কী ?

একজনের নাম অ, আরেকজনের নাম আ।

আনিকা ঠিক করে রেখেছে তার তিনটা ছেলেমেয়ে হবে। তিন খুবই লাকি নাম্বার। ছেলেমেয়েরা তিনজন আর তারা দু'জন। সব মিলিয়ে পাঁচজন। পাঁচও লাকি নাম্বার।

আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামল। আনিকা চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। সে চোখ মেলল। ফাঁকা অচেনা রাস্তা। মনে হচ্ছে শহর থেকে তারা অনেকদূরে চলে এসেছে।

আনিকা বলল, আমরা কোথায় ?

ড্রাইভার বলল, আশুলিয়ায়।

আনিকা বলল, সেটা আবার কোন জায়গা ?

উত্তরার কাছে। ভালো ভালো চটপটির দোকান আছে। আপা, চটপটি খাবেন ?

আনিকা বিরক্ত গলায় বলল, না। চটপটি খাব না। আমি চটপটি খাওয়া টাইপ মেয়ে না।

ড্রাইভার বলল, আপা, আপনারে একটা কথা বলি, কিছু মনে নিয়েন না।

আনিকা জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার ধারণা জ্বর আরো বেড়েছে। তার উচিত বাসায় ফিরে সিটামল টাইপ কোনো ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়া। জ্বর কমাতে হবে। কাল সকাল ন'টা থেকে অফিস। অফিস কামাই দেয়া যাবে না। ক্যাজুয়েল লিভ পাওনা নেই। সেকশান অফিসার সিদ্দিক সাহেব তাকে ভালো চোখে দেখেন না। সারাক্ষণ চেষ্টা কীভাবে ভুল ধরবেন। কয়েক দিন আগে জ্যামে পড়ে অফিসে যেতে এক ঘণ্টা দেরি হয়েছে, সিদ্দিক সাহেব বলেছেন, আরে ম্যাডাম, আজ যে এত সকালে! লাঞ্চ করে এসেছেন তাই না ? ভেরি গুড। নেক্সটটাইম শুধু লাঞ্চ করে আসবেন না, লাঞ্চের শেষে ঘুম দিয়ে আসবেন। দুপুরের ঘুম স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।

ড্রাইভার বলল, আপা, আপনাদের বিয়েটা হয় নাই ?

আনিকা বিরক্ত গলায় বলল, না।

ড্রাইভার বলল, পুরুষজাতের কোনো বিশ্বাস নাই। পুরুষজাত বিরাট হারামি। আমিও হারামি। আমার জীবনেও এইরকম ঘটনা আছে।

আনিকা বলল, আপনার জীবনের ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না। আপনি গাড়ি চালান। গাড়ি চালানোর সময় এত কথা বলেন কেন ?

আপা, গান দিব ?

গান দিতে হবে না। আপনি বরং ফিরে চলুন। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

লেকের ধারে নামবেন না?

আনিকা বলল, না। আমি লেক-ফেক দেখি না। আমার এত শখ নাই।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরাল। আনিকা বাসায় ফিরছে— এটা ভাবতে তার নিজের কাছে খারাপ লাগছে। ঝগড়া খেচাখেঁচির মধ্যে পড়তে হবে। এর মধ্যে আবার সিনেমাও দেখা হবে। তার বাবা সিনেমায় গানের দৃশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে তাল দেবেন। দেখে মনে হবে সঙ্গীতের বিরাট ওস্তাদ বসে আছেন। ওস্তাদ মতিয়ুর রহমান খান।

বাসায় না ফিরে অন্য কোথাও গেলে কেমন হয়? শওকতের বাসায় হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাকে চমকে দেয়া যায়। শওকত দরজা খুললেই সে বলবে, আমার খুব জ্বর। আজ আমি তোমার বাসায় থাকব। তুমি আমার সেবা করবে। মাথায় জলপট্টি দেবে। শওকত হকচকিয়ে বলবে, কী বলো পাগলের মতো! রাতে আমার এখানে থাকবে মানে?

আনিকা সহজ গলায় বলবে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকবে, এতে সমস্যা কী?

শওকত আরো অবাক হয়ে বলবে, স্ত্রী মানে? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে কখন হলো?

আনিকা বলবে, আজই তো বিয়ে হলো। মগবাজার কাজি অফিসে বিয়ে হলো। না-কি হয় নি? তাহলে বোধহয় জ্বরের ঘোরে এইসব মনে হচ্ছে। সরি। আমি চলে যাচ্ছি।

এরকম মজার নাটক আনিকার মাঝে-মাঝে করতে ইচ্ছা করে। অবশ্যি সে কখনোই করে না। সে ইচ্ছা-সুখ মেয়ে না। ইচ্ছা-সুখ হলো— যা করতে ইচ্ছা করে সেটা করে সুখ পাওয়া। আনিকা হলো ইচ্ছা-অসুখ মেয়ে। যা করতে ইচ্ছা করে তা না করতে পেরে অসুখী হওয়া।

শওকতের বাড়িতে যাবার প্রশ্নই আসে না। তার উচিত প্রাণপণে শওকতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করা। সে এমন কিছু না যে তাকে ভেবে সারাক্ষণ কষ্ট পেতে হবে। মানুষটার বয়স হয়েছে পঞ্চাশ। বাংলাদেশের মানুষদের গড় আয়ু চল্লিশ। সেই হিসেবে সে দশ বছর বেশি বেঁচে ফেলেছে। তার ঘণ্টা বেজে গেছে। যে-কোনো সময় ফুড়ুৎ। প্রাণপাখি উড়ে যাবে। প্রাণপাখি নিয়ে সুন্দর একটা গানও আছে—

উড়িয়া যায়রে প্রাণপাখি তিন দরজা দিয়া
খবর আইছে প্রাণপাখির আইজ সইন্ধ্যায় বিয়া ॥

মানুষটার প্রাণপাখি তিন দরজা দিয়ে বের হয়ে বিয়ে করতে যাবে। তখন আনিকার কী হবে! সে বিধবাদের সাদা শাড়ি পরে অন্য কোনো সেকেন্ডহ্যান্ড পুরুষের সন্ধানে বের হবে ? তার জীবন কেটে যাবে সন্ধানে সন্ধানে ? সেকেন্ড হ্যান্ড, থার্ড হ্যান্ড, ফোর্থ হ্যান্ড।

শওকতের টাকা-পয়সাও নেই। ঘরে টিভি নেই। গান শোনার যন্ত্র নেই। শোবার ঘরে একটা ফ্যান আছে, সেখান থেকে সারাক্ষণ কটকট ঘটঘট শব্দ হয়। মিস্ত্রি ডাকিয়ে ফ্যান সারাবে— সেই পয়সাও হয়তো তার নেই।

মানুষটার বাসা ভাড়া করার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। অন্যের বাসায় থাকে। ঠিক অন্যের বাসাও না— তার মামার বাসা। মামা-মামি থাকেন দেশের বাইরে। তারা শ্যামলীতে সাত কাঠা জায়গা কিনে— দুই কামরার টিনের একটা হাফ বিল্ডিং বানিয়ে শওকতকে পাহারাদার হিসেবে রেখে দিয়েছেন। যেন জমি অন্য কেউ দখল নিতে না পারে। মামা-মামি দেশে ফিরে এই জমিতে বাড়ি করবেন। তারা যে-কোনো দিন দেশে চলে আসবেন। তখন শওকতের কী হবে ? মামা-মামি অবশ্যই গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেবে। সে যাবে কোথায় ? কাক-বক-গাছপালা এঁকে কি কোনো মানুষ জীবন চালাতে পারে ? শওকত একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে একটানে একটা ছাগল এঁকে ফেলতে পারে। তাতে লাভ কী ? ছাগল আঁকার দরকারটাই বা কী! ক্যামেরায় ছাগলের ছবি তুললেই হয়।

অনেকদিন পর তার ছেলেটা তার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। ভালো-মন্দ কিছু যে সে এই ছেলের জন্যে করতে পারবে তা তো মনে হয় না। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দিনরাত টিভি দেখতে চায়। তার উচিত ছোট হলেও একটা রঙিন টিভি কেনা। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা। কিছু খেলনা কেনা।

আনিকা ঠিক করে ফেলল, কাল অফিস থেকে ফেরার পথে শওকতের বাসায় যাবে। একটা খামে কিছু টাকা ভরে দরজার নিচ দিয়ে ফেলে দেবে। সাদা মুখবন্ধ খাম দেখে শওকত বুঝতে পারবে না টাকাটা কোত্থেকে এসেছে। বোঝার দরকারই বা কী ?

কত টাকা দেয়া যায় ? পাঁচ হাজার। টিভি কিনতে চাইলে পাঁচ হাজারে হবে না। দশ হাজার দেয়া দরকার। আনিকার টাকা আছে। প্রতি মাসেই সে বেতনের টাকার একটা অংশ জমায়। বোনাসের টাকার পুরোটাই জমায়। দুই লাখ এগারো হাজার টাকা তার জমা আছে। টাকাটা সে জমাচ্ছে বিয়ের জন্যে। নতুন সংসার শুরু করতে কত কিছু লাগে। প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসের জন্যে সে তো আর শওকতের কাছে হাত পাততে পারবে না। অবশ্যি যদি শওকতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

আনিকা বাসায় ফিরল সন্ধ্যা সাতটায়। তাকে দেখে তার মা মনোয়ারা ছুটে এসে বললেন, ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়েছে। এক লোক বাসায় টেলিফোন করে তোর বাবাকে হামকি ধামকি করেছে। গুণ্ডাদের মতো মোটা গলা। তোর বাবা ভয়ে অস্থির। ভীতু মানুষ তো!

আনিকা বলল, বাবাকে হামকি ধামকি করবে কেন ?

মনোয়ারা বললেন, .মিতুকে তোর বাবা মেরেছে— সেই খবর পেয়ে টেলিফোন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবা যদি তার মেয়েকে মারে, বাইরের লোক হামকি ধামকি করবে কেন ?

মিতু কী বলে ?

সে বলে, আমি কিছু জানি না।

মিতু কোথায় ?

দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি করছি। দরজা খুলছে না। সাড়া-শব্দও করছে না। ঘুমের ওষুধ-টষুধ কিছু খেয়েছে কি-না কে জানে। তুই একটু দেখবি ?

আনিকা বলল, আমি কিছু দেখতে-টেখতে পারব না মা। আমার জ্বর। আমি গরম পানি দিয়ে গোসল করে শুয়ে থাকব।

জ্বরের মধ্যে গোসল করবি কেন ?

গা ঘিনঘিন করছে। এই জন্যে গোসল করব।

গোসল করতে করতে আনিকা শুনল, তার মা মিতুর ঘরের দরজা খোলার জন্যে খুবই চেষ্টা চালাচ্ছেন। 'মা দরজা খোল। তোকে কেউ কিছু বলবে না। আচ্ছা যা, দরজা না খুললে খুলবি না, একটু কথা বল। তোর বাবাকে যে টেলিফোন করেছে, সেই ছেলেটা কে ?'

মিতুর ঘর থেকে কোনো শব্দ আসছে না।

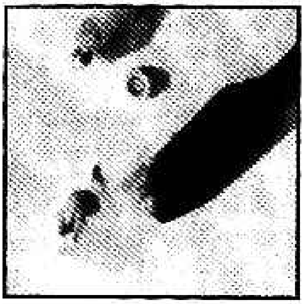

রেবেকা ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইমন বসে আছে মেঝেতে। তার হাতে কাঁচি। সামনে কিছু লাল-নীল কাগজ, আইকা গাম। কাগজ কাটার চেষ্টা করছে কিন্তু কাঁচি ঠিকমতো ধরতে পারছে না। অনেক বয়স্ক মানুষই কাঁচি ঠিকমতো ধরতে পারেন না। ন' বছর বয়েসী একটা ছেলের পারার কথা না। রেবেকা একবার ভাবলেন— ছেলেকে ডাক দিয়ে কাছে বসিয়ে কাঁচি ধরা শিখিয়ে দেবেন। তারপর মনে হলো প্রয়োজন নেই। শিখুক নিজে নিজে। ভুল করে করে শিখবে। Through mistakes we learn. এটাও অনেকে পারে না। অনেকে সারাজীবন ভুলই করে যায়। কিছু শিখতে পারে না।

রেবেকা ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, Hello! ছেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর কাগজ কাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইমন কথা খুব কম বলে। সে চেষ্টা করে প্রশ্নের জবাব ইশারায় দিতে। যে সব প্রশ্নের জবাব ইশারায় দেয়া যাবে না— সেইসব প্রশ্নের জবাব সে দেয়, তবে অনাগ্রহের সঙ্গে দেয়।

কী বানাচ্ছ ইমন?

চাইনিজ লণ্ঠন।

চাইনিজ লণ্ঠন ব্যাপারটা কী?

মা, তোমাকে পরে বলি?

না এখন বলো।

চাইনিজ লণ্ঠন হলো এক ধরনের লণ্ঠন। লাল-নীল কাগজ দিয়ে বানাতে হয়। ভেতরে মোমবাতি থাকে। চিমনির মতো লাল-নীল কাগজ থাকে বলে রঙিন আলো হয়।

রেবেকা খুশি হয়ে লক্ষ করলেন, ছেলে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছে। অনাগ্রহের সঙ্গে যে বলেছে তা না, আগ্রহের সঙ্গেই বলেছে। এটা খুবই ভালো লক্ষণ। স্কুলে ইমনকে ডিসটার্বড চাইল্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্কুল থেকে ঠিক করা এক সাইকিয়াট্রিস্ট ইমনকে দেখছেন। তিনি বারবার

বলেছেন, কথা না-বলা রোগ থেকে ইমনকে বের করে আনতে হবে। তার সঙ্গে প্রচুর কথা বলতে হবে। কৌশলে তাকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। তবে কখনোই বুঝতে দেয়া হবে না যে তাকে দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে তার ডিফেন্স মেকানিজম আরো কঠিন হয়ে যাবে।

ইমনকে যে বাংলাদেশে আনা হয়েছে তা সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শেই আনা হয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছেন সব শিশুই একজন ফাদার ফিগারের অনুসন্ধান করে। মা'র কাছে সে চায় আশ্রয়। বাবার কাছে নেতৃত্ব। নির্দেশনা। এক সময় আমাদের আদি পূর্বপুরুষরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বনে-জঙ্গলে অসহায় জীবনযাপন করত। নেতৃত্বের ব্যাপারটা তখনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। একজন ভালো নেতার দলে থাকলেই সারভাইভেলের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অতি প্রাচীন এই ধ্যান-ধারণা জিনের মাধ্যমে বর্তমান মানুষদের মধ্যেও চলে এসেছে। এখনো মানুষ খোঁজে নেতা।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক হাসিমুখে খুব গুছিয়ে কথা বলেন। তাঁর প্রতিটি কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

ম্যাডাম, আপনি আপনার পুত্রকে কিছুদিনের জন্যে হলেও তার বাবার কাছে ফেলে রাখুন। তার ফাদার-ফিগার অনুসন্ধান তৃপ্ত হোক।

কিছুদিন ফেলে রাখলেই হবে ?

কিছুটা তো হবেই। তার বাবা যদি বুদ্ধিমান হন, তাহলে ছেলের সমস্যা ঠিক করে ফেলতে পারবেন। তার বাবা কি বুদ্ধিমান ?

হ্যাঁ, বুদ্ধিমান। তার অনেক কিছুর অভাব আছে, বুদ্ধির অভাব নেই।

সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, সেই ভদ্রলোকের কী কী অভাব আছে, একটু বলুন তো। নোট করি।

তার প্রয়োজন আছে কি ?

হ্যাঁ প্রয়োজন আছে।

সে সবসময় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আশেপাশের কাউকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে না। সে মনে করে সে নিজে যা ভাবছে, তা-ই ঠিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট হেসে বললেন, সব মানুষই কিন্তু এরকম। কেউ একটু বেশি কেউ কম। এখন বলুন, এই ভদ্রলোককে কি আপনি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

তার কোন গুণটি দেখে তাকে ভালোবেসেছিলেন ?

রেবেকা ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন। প্রশ্নটার জবাব দিতে তার ইচ্ছা করছিল না। সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে কথা বলুন। আপনিও যদি আপনার ছেলের মতো চুপ করে থাকেন, তাহলে কীভাবে হবে! প্লিজ স্পিক আউট। তাকে কেন বিয়ে করলেন সেটা বলুন।

আর্ট কলেজে একবার ফোর্থ ইয়ারের ছেলেদের এক্সিবিশন হচ্ছে। আমি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছবি দেখতে গেছি। একটা ওয়েল পেইন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি হতভম্ব। ছবিটা জঙ্গলের ছবি। গভীর জঙ্গলে একটি তরুণী মেয়ে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। খুবই সুন্দর ছবি। চোখ ফেরানো যায় না এমন ছবি। কিন্তু আমি হতভম্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। বনের ভেতর যে মেয়েটা শুয়ে আছে সে আমি। আমার চোখ, আমার মুখ। আমার মাথার চুল লালচে ধরনের। মেয়েটির মাথার চুলও সেরকম। আমি কিছু বলার আগেই আমার বান্ধবীরা চেঁচিয়ে বলল, এ কী এটা তো তোর ছবি!

আমি আর্টিস্টকে খুঁজে বের করলাম। তার চেহারা সুন্দর। কথাবার্তা সুন্দর। স্বপ্ন স্বপ্ন চোখ। কোনো একটা মজার কথা বলার আগে মানুষের মুখে যে-রকম এক্সপ্রেশন হয়, তার মুখের এক্সপ্রেশন সেরকম। যেন এক্ষুণি সে মজার কোনো কথা বলবে। আমি তাকে গিয়ে বললাম, আপনার ছবির এই মেয়েটি কি আমি? সে অবাক হয়ে বলল, আপনি হবেন কেন? আমি আপনাকে চিনি না। আপনি আমার ছবির জন্য মডেলও হন নি।

আপনি বলতে চান পুরো ছবিটা আপনি মন থেকে এঁকেছেন?

না, আমি মন থেকে আঁকি নি। মধুপুর শালবনে রঙ-তুলি নিয়ে গিয়েছি। ছবিটার কাঠামো সেখানে করা।

মেয়েটির ছবি মন থেকে এঁকেছেন?

জি।

আপনি আপনার নিজের ছবির দিকে তাকান এবং আমার দিকে তাকান, তারপর বলুন ছবিটির মেয়ে এবং আমি দু'জন কি একই ব্যক্তি?

অস্বাভাবিক মিল তো আছেই।

মিল কেন হলো?

ছেলেটা তখন হেসে বলল, হয়তোবা কোনো না কোনোভাবে আপনি আমার কল্পনায় ছিলেন। আপনার সঙ্গে কল্পনার জগতে আমার পরিচয় আছে। মিল দেখে আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? আপনার তো উচিত খুশি হওয়া।

আমি রেগে গিয়ে বললাম, আমি কেন খুশি হবো ? এই ছবিটা কেউ একজন কিনে নিয়ে তার ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখবে। আমি একজন মানুষের ড্রয়িংরুমে শুয়ে থাকব, যাকে আমি চিনি না।

অন্যের ড্রয়িংরুমে আপনি শুয়ে থাকবেন কেন ? আপনি ছবিটা কিনে নিয়ে যান। আপনার শোবার ঘরে টানিয়ে রাখুন। আপনি শুয়ে থাকবেন আপনার শোবার ঘরে।

ছবিটার দাম কত ?

দাম লেখা আছে পনের হাজার টাকা। তবে আপনি যা দেবেন আমি তা-ই নেব। খুবই টাকা-পয়সার টানাটানিতে আছি। একটা ছবি বিক্রি করতে না পারলে কলেজের বেতন দিতে পারব না। খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ।

আমি সেই দিনই পনের হাজার টাকা দিয়ে ছবি কিনলাম। আমার ইচ্ছা ছিল ছবি নিয়ে বাড়ি ফেরা, সেটা সম্ভব হলো না। যতদিন এক্সিবিশন চলবে ততদিন ছবি রাখতে হবে। তবে আমি ছেলেটির সঙ্গে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে গেলাম। সেই লাঞ্চ করতে যাওয়াটাই আমার জন্যে কাল হলো। ছেলেটা হঠাৎ বলল, এত অল্প বয়েসী কোনো মেয়ে যে তার ব্যাগে এতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরতে পারে— তা তার কল্পনাতেই নেই। এটা বলেই সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, কল্পনার জগতে আপনার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল। সেই জগতে আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে হাঁটতাম। এখন আমরা বাস্তবে বাস করছি। আমি কি বাস্তবের এই মেয়েটাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি ? তার কথা শুনে আমার হঠাৎ কী যেন হলো, আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কোনো সমস্যা নেই, ছুঁয়ে দেখুন।

অতি দ্রুত আমরা বিয়ে করে ফেললাম। আমার বাবা, আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার উপর খুবই রাগ করলেন। কোর্টে বিয়ে করে মা'কে যখন খবর দিলাম, তখন তার স্ট্রোকের মতো হলো। But I was happy.

সাইকিয়াট্রিস্ট রেবেকার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাদের বিবাহিত জীবনে প্রথম বড় ধরনের সমস্যা কখন হলো ? মানে কোন সে ঘটনা ?

রেবেকা শান্ত গলায় বলল, যে দিন তার ওয়েল পেইন্টিং-এ আমার চেহারার মেয়েটির রহস্য পরিষ্কার হলো সেদিন।

রহস্যটা কী ?

আমার এক কাজিন আছে এয়ারফোর্সে। পাইলট। সে আমাকে আমার জন্মদিনে উপহার দেবে বলে আমার ছবি দিয়ে একটা ছবি ইমনের বাবাকে আঁকতে বলে। আমার একটা বড় ছবি সে-ই ইমনের বাবাকে দিয়ে আসে। ছবি

আঁকা হয়। কিন্তু আমার কাজিনকে তখন এয়ারফোর্স থেকে পাঠিয়ে দেয় সোভিয়েট ইউনিয়নে কী একটা ট্রেনিং-এ। সে আর ছবিটা ইমনের বাবার কাছ থেকে নিতে পারে নি।

ছবির পেছনের এই রহস্য আপনি আপনার স্বামীর কাছ থেকে জানতে পারেন, না-কি আপনার কাজিন আপনাকে বলেন ?

আমার কাজিন আমাকে বলেন। ইমনের বাবা পুরো ব্যাপারটা গোপন করেছিল।

পেইন্টিংটা কি আছে আপনার কাছে ?

না। যেদিন আমাদের ডিভোর্স হয়ে যায়, সেদিনই আমি ছবিটা নষ্ট করে ফেলি।

এখন কি মনে হয় না কাজটা ভুল হয়েছে ?

না, মনে হয় না।

আপনি কি ভেবে-চিন্তে বলছেন, না-কি রাগ করে বলছেন ?

আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি। রাগ করে বলছি না। ছবিটা অবশ্যই সুন্দর ছিল। কিন্তু সেই সুন্দরের মধ্যে ছিল প্রতারণা। প্রতারণা আমার পছন্দ না। সুন্দর প্রতারণা সহ্য করে না।

আপনি নিজে কখনো কারো সঙ্গে প্রতারণা করেন নি ?

না, আমি কখনোই কারো সঙ্গে প্রতারণা করি নি।

নিজেকে নিজে প্রতারণা করেন নি ?

তা হয়তো করেছি।

ইমন কাঁচি দিয়ে এখনো কাগজ কাটছে। তবে কাগজ কাটতে গিয়ে সে তার হাত কেটে ফেলেছে। মোটামুটি ভালোই কেটেছে। বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছে। ইমন রঙিন কাগজের একটা টুকরা রক্তের উপর দিয়ে রেখেছে, যাতে ব্যাপারটা মায়ের চোখে না পড়ে। রেবেকা ব্যাপারটা দেখেছেন। তার মন খারাপ হয়েছে। ছেলেটা এরকম হচ্ছে কেন ? ব্যথা পেয়েছে সে বলবে। চিৎকার করবে। কাঁদবে। নিজেকে আড়াল করবে কেন ?

ইমন। তাকাও আমার দিকে।

ইমন তাকাল। রেবেকা হাত কাটা প্রসঙ্গ তুলতে গিয়েও তুললেন না। ছেলে তাকে কিছু জানাতে চাচ্ছে না যখন, তখন আগ বাড়িয়ে প্রশ্ন করার দরকার কী! রেবেকা বললেন, তোমার চাইনিজ লণ্ঠনের কতদূর ? আর কতক্ষণ লাগবে ?

বুঝতে পারছি না।

কাগজ কাটতে কি অসুবিধা হচ্ছে? আমি কেটে দেব? Do you need my help?

না।

আগামীকাল তোমার বাবা তোমাকে নিতে আসবেন। তুমি কি তা জানো?

ইমন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তুমি যা যা সঙ্গে নেবে সব গুছিয়ে নাও।

আমি গুছিয়ে রেখেছি।

কখন গোছালে?

ইমন জবাব দিল না। রেবেকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইমন নিজে নিজেই তার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছে। তার মা'কে কিছু জানায় নি। বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে যে ব্যস্ততা তার মধ্যে আছে, সে তা মা'র কাছে গোপন করছে। কেন করছে? তার কি ধারণা মা রাগ করবে?

ইমন শোন, তোমার কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবাকে জানাবে। তুমি যে নিজ থেকে কিছু বলো না— তা তো তোমার বাবা জানে না। আমি তোমার স্বভাব জানি বলেই তোমার দিকে লক্ষ রাখি। তোমার বাবা তা রাখবে না। ঠিক আছে?

হুঁ।

এই যে তুমি হাত কেটে ফেলেছ, আমি ব্যাপারটা দেখেছি। তোমার বাবা দেখবেও না। পুরুষমানুষ এত খুঁটিয়ে কিছু দেখে না।

কেন?

প্রকৃতি ছেলেদের একরকম করে বানিয়েছে আর মেয়েদের অন্যরকম করে বানিয়েছে।

কারা বেশি ভালো?

তোমার কী ধারণা? কারা বেশি ভালো?

জানি না।

না জানলেও তোমার নিজের একটা চিন্তা আছে। সেই চিন্তাটা বলছ না। কারণ, তোমার ধারণা তুমি যা ভাবছ তা বললে আমি রাগ করব। তোমার চিন্তায় ছেলেরা বেশি ভালো। ঠিক বলেছি বাবা?

হুঁ।

এখন লক্ষ্মীছেলের মতো আমার ঘরে যাও। আমার ড্রয়ার খুলে ব্যান্ড এইড নিয়ে এসো। তোমার কাটা হাতে লাগিয়ে দিচ্ছি।

ইমন ব্যান্ড এইড নিয়ে এলো। রেবেকা ছেলের হাতে ব্যান্ড এইড লাগাতে লাগাতে বললেন, বাংলাদেশ তোমার কেমন লাগছে ?

ইমন বলল, ভালো লাগছে।

বাংলাদেশের কোন জিনিসটা ভালো লাগছে ?

সব ভালো লাগছে।

বাহ্ ভালো তো। কোন জিনিসটা খারাপ লাগছে ?

লিজার্ড। ঘরের দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়।

এই ধরনের লিজার্ডকে আমরা বলি টিকটিকি। তুমি যে টিকটিকি ভয় পাও, তা অবশ্যই বাবাকে আগেই বলে দিও।

আচ্ছা।

আমি তোমার সঙ্গে একটা সেল ফোন দিয়ে দেব। সেল ফোন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দেব। কোনো সমস্যা হলেই আমাকে টেলিফোন করবে।

হুঁ।

ইমন আবার রঙিন কাগজের কাছে বসল। রেবেকাও ছেলের কাছে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, চাইনিজ লণ্ঠন বানানো কোথায় শিখেছ ?

ইমন বলল, স্কুলে। আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্লাসে। মা, আমার কিছু শক্ত কাগজ লাগবে।

কী রকম শক্ত কাগজ ?

ওয়ান মিলিমিটার থিক হার্ড বোর্ড।

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমাকে বলে দাও কী করতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করি।

ইমন বলল, না।

রেবেকা বললেন, না কেন ?

ইমন বলল, চাইনিজ লণ্ঠনটা আমি বাবার জন্যে নিয়ে যাব গিফট। আমি একা বানাব।

তুমি তো একাই বানাচ্ছ। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করব।

ইমন শান্ত গলায় বলল, না।

শওকত বলল, হ্যালো, কে অনিকা ?

আনিকা জড়ানো গলায় বলল, আমার নাম অনিকা না। আমার নাম আনিকা। একটা আকার আছে।

তুমি আজ অফিসে যাও নি ?

না।

শরীর খারাপ না-কি ?

শরীর ভালো। বেশি রকম ভালো। এই জন্যেই অফিসে যাই নি। ঠিক করেছি— আজ সারাদিন মজা করব। একটা ক্যাব ভাড়া করে ময়নামতি যাব। ছোটবেলায় একবার ময়নামতি যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নি। হ্যালো শোন, তুমি কি আমার সঙ্গে ময়নামতি যাবে ?

আজ তো যেতে পারব না। আজ আমার ছেলে আসবে।

ভুলে গিয়েছিলাম। আজ পাঁচ তারিখ। ঘর গুছিয়ে রেখেছ ?

মোটামুটি গুছিয়েছি।

আমাকে কী জন্যে টেলিফোন করেছ ? পুত্রের আগমন সংবাদ দিতে, না অন্য কোনো কারণ আছে ?

একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

আলাপ করো।

ঘটনাটা হলো কাল সন্ধ্যায় আমি বাসায় ফিরে দেখি, দরজার নিচ দিয়ে কে যেন একটা মুখবন্ধ খাম ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

খামে কী আছে ? প্রেমপত্র ?

খামে পাঁচশ' টাকার বিশটা নোট। আচ্ছা শোন, টাকাটা কি তুমি দিয়েছ ?

আমি ? আমি টাকা দেব কোন দুঃখে ?

হঠাৎ করে মনে হলো তুমি কি-না। অনেকদিন পরে ছেলে আসছে, এদিকে আমার হাত খালি। তুমি বিষয়টা জানো বলে...।

জনাব শোনেন, আমি মহিলা হাজী মুহম্মদ মহসিন না। আমি অতি কৃপণ এক মহিলা। যে খেয়ে না-খেয়ে টাকা জমায়। কী জন্যে জমায় জানেন, একদিন সে সংসার করবে। সংসারে টুকটাক খরচ করবে। একটা মাইক্রোওয়েভ অভেন কিনবে, একটা প্রেসারকুকার কিনবে, একটা রাইস কুকার...

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তোমার শরীর খারাপ। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছি, আমার কথা তো জড়াবেই। কিসে জড়িয়ে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলে না?

কিসে জড়িয়ে যাচ্ছ?

দুঃখজালে জড়িয়ে যাচ্ছি। মানুষ জড়ায় প্রেমজালে, আমি জড়াই দুঃখজালে।

আনিকা, টেলিফোন রাখি?

কেন, এক্ষুণি কি তোমার ছেলেকে আনতে যেতে হবে?

ওকে আনতে যাব বিকেলে।

বিকেল হতে এখনো অনেক দেরি। কিছুক্ষণ কথা বলো।

কী নিয়ে কথা বলব?

কী নিয়ে কথা বলবে তাও আমি বলে দেব? আজকাল দেখি আমার সঙ্গে কথা বলার মতো কোনো টপিকও খুঁজে পাও না। নতুন কোনো অল্পবয়েসীর সঙ্গে কি প্রণয় হয়েছে? তার নাম কী?

তুমি কী সব কথা যে বলো!

অ্যাই শোন, তুমি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বাঁধানো খাতা জোগাড় কর। সেই খাতায় তুমি এ পর্যন্ত যে ক'টি মেয়ের প্রেমে পড়েছ, তাদের নাম-ধাম লিখে রাখ। প্রথমে লিখবে নাম। তারপর লিখবে বয়স। তারপর লিখবে কী কারণে প্রেমে পড়লে। সব শেষে লেখা থাকবে কী কারণে প্রেম চলে গেল।

অনিকা আমি রাখি?

আবার অনিকা বলছ? আমার নাম আনিকা। একটা আকার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি আমাকে অনিকাই ডাক। অনিকা ডাকার একটা সুবিধা আছে।

কী সুবিধা?

তুমি তোমার প্রেমিকাদের নাম অ্যালফাব্যাটিলি নিশ্চয় সাজাবে। সেখানে আমার নাম সবার আগে চলে আসবে। আনিকা নাম হলে অনেক পেছনে পরে যাব। প্রথমে স্বরে অ, তারপর স্বরে আ। হ্যালো, টেলিফোন কি রেখে দিলে?

না।

তুমি কতদিন পর আমাকে টেলিফোন করেছ, সেটা জানো ?

না জানি না।

ঠিক এক মাস তিন দিন পর। তুমি শেষ টেলিফোন করেছিলে গত মাসের দু'তারিখে। আজ পাঁচ তারিখ।

তুমি সব দিন-তারিখ মুখস্থ করে রাখ ?

হ্যাঁ রাখি। তোমার সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু মুখস্থ করে রাখি।

আনিকা শোন, আমি একটা দোকান থেকে টেলিফোন করছি। দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলছি, ওরা নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছে।

বিরক্ত হচ্ছে না, ওরা খুশি হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ওদের মিনিট হিসেবে টাকা দেবে। তুমি যত বেশি কথা বলো ওদের ততই লাভ। তাছাড়া এখন তোমার কাছে দশ হাজার টাকার বান্ডেল আছে। টাকার সমস্যা নেই। আরো তিন মিনিট কথা বলো। তুমি কি জানো টেলিফোনে তোমার গলার স্বর অদ্ভুত সুন্দর ?

জানতাম না। এখন জানলাম।

আমাদের বাসায় গতকাল সন্ধ্যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়েছে।

কী কাণ্ড হয়েছে ?

ধুন্ধুমার কাণ্ড। মিতুর স্বামী মিষ্টি, কাপড়-চোপড় নিয়ে উপস্থিত। বাবার জন্য পাঞ্জাবি, আমার এবং মা'র জন্যে শাড়ি।

মিতুর স্বামী মানে ? মিতু কি বিয়ে করেছে না-কি ?

হ্যাঁ, ও আগস্ট মাসেই বিয়ে করে ফেলেছে। তার স্বামীর কাঠের দোকান আছে। দোকানের নাম Wood king। মিতুর বর হচ্ছে বনের রাজা।

মিতু গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে ? আশ্চর্য তো!

আশ্চর্য হবার কী আছে! মিতু আমার মতো না। সাহসী মেয়ে।

তোমাদের বাড়ির সবার রিঅ্যাকশান কী ? সবাই মেনে নিয়েছেন ?

আমি এবং মা, আমরা দু'জন খুশি। মা খুশি, কারণ মিতুর বনের রাজার চেহারা সুন্দর। লম্বা-ফর্সা। সে প্রতিটি বাক্যে তিনবার করে বলছে মা। আমি খুশি, কারণ সে আমার জন্যে যে শাড়িটা এনেছে সেই শাড়িটা সুন্দর। কালো মেয়েদের সব শাড়িতে মানায় না। এই শাড়িতে মানাবে। শাড়িটার রঙ হালকা গোলাপি। গোলাপির উপর রুপালি ফুল। তুমি আর্টিস্ট মানুষ। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ কালোর সঙ্গে হালকা গোলাপি এবং সিলভার কালার খুব ভালো যায়।

বুঝতে পারছি। তোমার বাবা— উনার রিঅ্যাকশান কী ?

বাবার রিঅ্যাকশান যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং। ছেলে চলে যাবার পর বাবা আমাকে ডেকে বললেন— ঐ ছেলে যে পাঞ্জাবিটা এনেছে, সেটা বাথরুমে রেখে আয়। আমি বললাম, কেন? বাবা বললেন, আমি ঐ পাঞ্জাবির উপর পিশাব করব, এই জন্যে। হ্যালো শোন, তিন মিনিট পার হয়েছে। এখন তুমি টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পার। যে তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে, তার প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। সে টাকাটা পাঠিয়েছে বলেই তুমি আমাকে টেলিফোন করেছ।

টাকাটা কে দিতে পারে বলো তো? ইমনের মা না তো?

উনি পরিত্যক্ত স্বামীকে টাকা পাঠাবেন কী জন্যে!

সে জানে আমি হতদরিদ্র। ছেলে আসছে আমার সঙ্গে থাকতে। ছেলের যেন কষ্ট না হয়। সরাসরি আমাকে দিতে লজ্জা পাচ্ছিল বলে কাউকে দিয়ে খামে ভরে টাকাটা পাঠিয়েছে।

হতে পারে। সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমি কি টাকার ব্যাপারটা তাকে জিজ্ঞেস করব?

জিজ্ঞেস না করাই ভালো। তিনি যদি টাকাটা দিয়ে থাকেন, তাহলে কোনো না কোনোভাবে সেটা তিনি তোমাকে জানাবেন।

কেন জানাবে?

জানাবেন কারণ কোনো মানুষ যখন কারোর উপকার করে, তখন তার একটা চেষ্টাই থাকে উপকারের বিষয়টা মনে করিয়ে দেবার। কোনো মানুষই মহাপুরুষ না। এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটা জায়গাতে মহাপুরুষরা বাস করেন। আর কোথাও বাস করেন না।

মহাপুরুষরা কোথায় বাস করেন?

ডিকশনারিতে।

আনিকা টেলিফোন রেখে দিয়ে উঠে বসল। নিজেই কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখল। জ্বর আগের মতোই আছে না-কি কিছুটা কমেছে বোঝা যাচ্ছে না। বালিশের নিচে থার্মোমিটার আছে। ইচ্ছা করলেই জ্বর দেখা যায়। দেখতে ইচ্ছা করছে না। বরং জ্বর নেই— এমন ভাব করে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। সাজতে ইচ্ছা করছে। মিতুর দেয়া শাড়িটা পরে কোনো একটা পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে এলে কেমন হয়? আজকাল সব মেয়েরা ফ্যাসিয়েল করে। এতে না-কি মুখের চামড়া কমনীয় হয়। আনিকা কখনো এই জিনিস করে নি। একবার করে দেখলে হয়। আনিকা গুনগুন করে গাইলো— 'ওগো সুন্দরী, আজ অপরূপ সাজে সাজো সাজো সাজো।' একটি লাইন বলেই চুপ করে গেল। তার খুব

সুন্দর গানের গলা ছিল। তাদের স্কুলের গানের টিচার শিবু স্যার বলতেন, তোর গানের গলা প্রতিমার চেয়েও মিষ্টি। তুই গান করলে খুব নাম করবি। গান শিখবি ? আমি তোকে গান শেখাব। আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দিতে হবে না। তুই শুধু ভালো দেখে একটা হারমোনিয়াম কিনবি।

আনিকা বাবাকে হারমোনিয়ামের কথা বলেছিল। মতিয়ুর রহমান অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুধু হারমোনিয়াম ? ঘুংঘুর কিনে দেই ? বাইজি হয়ে যা। তারপর তোকে পাড়াতে রেখে আসি। গান করবি, নাচ করবি। দুই হাতে টাকা কামাবি।

রেকর্ড শুনে শুনে শেখা একটা গান শিবু স্যার প্রায় জোর করেই তাকে দিয়ে স্কুলের রজতজয়ন্তীতে গাইয়েছিলেন। নজরুলের গান— 'ওগো মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম'। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী। তিনি অনুষ্ঠান শেষে তাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, নাম কী মা তোমার ? আনিকা ভয়ে ভয়ে নিজের নাম বলল। শিক্ষামন্ত্রী বললেন, তোমার গান শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখে পানি এসে গেল। আমরা রাজনীতি করা ঘাঘু লোক। আমাদের চোখে পানি আনা কঠিন ব্যাপার। খুবই তৃপ্তি পেয়েছি গো মা।

আরো অনেক বড় বিস্ময় আনিকার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিন পর শিল্পকলা একাডেমির ডিজি এক চিঠিতে জানালেন— শিশুশিল্পীদের একটা দল তুরস্ক যাবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। নজরুলসঙ্গীতের তালিকায় আনিকার নাম আছে। সে যেন আগামী শুক্রবার থেকে রিহার্সেলে আসে।

তুরস্ক যাওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার, ভয়ে এই চিঠির কথা সে তার বাবাকে বলতেই পারে নি। স্কুল থেকে অ্যাসিসটেন্ট হেডমিসট্রেস রাবেয়া আপা এসেছিলেন। মতিয়ুর রহমান তার কাছ থেকে তুরস্ক বিষয়ক সব কথা শুনে গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার কি মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে ? আমি আমার মেয়েকে একা একা পাঠাব তুরস্ক ?

অ্যাসিসটেন্ট হেডমিসট্রেস বললেন, একা তো যাচ্ছে না, আরো অনেক ছেলেমেয়ে যাচ্ছে।

মতিয়ুর রহমান বললেন, আপনাদের মস্তিষ্ক বিকৃতিরোগ হয়েছে বলে তো আমার হয় নাই। আমার মেয়ে কোথাও যাবে না। মেয়ের যথেষ্ট সাহস হয়ে গেছে। আমাদের কিছু না জানিয়ে স্কুল ফাংশনে গান গায়। গোপনে গোপনে আঙ্গুরবালা। আমি তার বালাগিরি বের করছি।

তার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে কঠিন শাস্তি দেন। মনোয়ারার জন্য পারলেন না। কঠিন গালাগালি দিয়েই তাকে খুশি থাকতে হলো। শেষ পর্যায়ে শুধু বললেন—

তোমাকে আর স্কুলে যেতে হবে না। বাসায় থাকবে। মা'কে রান্নাবান্নায় সাহায্য করবে। অতি শিগগিরই তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করছি। কোনো বড় কেলেঙ্কারি হয়ে যাবার আগেই ঘর থেকে আপদ বিদায় করতে হবে। তোমার যা অবস্থা। হঠাৎ কোনো একদিন দেখব পেট বাঁধিয়ে ঘরে ফিরেছ।

মতিয়ুর খুব আগ্রহ নিয়ে টিভিতে রান্নার একটা প্রোগ্রাম দেখছেন। মুরগি মুসাল্লাম যে এত সহজে রান্না করা যায়— তাঁর ধারণায় ছিল না। হাতের কাছে কাগজ-কলম থাকলে সুবিধা হতো— লিখে রাখতে পারতেন।

আনিকাকে সাজগোজ করে বের হতে দেখে তিনি টিভি থেকে মুখ ফেরালেন। বিস্মিত হয়ে মেয়েকে ডাকলেন। জ্বর এসেছে বলে যে মেয়ে অফিসে যায় নি, সে এখন যাচ্ছে কোথায়? মিতুর বদ জামাইটা যে শাড়ি নিয়ে এসেছে, সেই শাড়িটাই সে পরেছে। দুয়ে-দুয়ে চার মিলানো যাচ্ছে। আনিকার গন্তব্য মিতুর শ্বশুরবাড়ি। অথচ তিনি কঠিন গলায় বলে দিয়েছিলেন— ঐ বাড়িতে যদি কেউ যায়, তাহলে তার ঠ্যাং ভেঙে ফেলা হবে।

তুই যাচ্ছিস কোথায়?

কাজে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম জ্বরে কোঁ কোঁ করছিস। এখন আবার কাজে যাচ্ছিস। কী এমন কাজ যে পটের রাণী সেজে যেতে হয়?

আনিকা বলল, পটের রাণী সাজি নি বাবা। শুধু নতুন একটা শাড়ি পরেছি।

তুই কি মিতুর শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিস? ঐ বাড়িতে গেলে আমি কিন্তু তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব।

আনিকা শান্ত গলায় বলল, ঠ্যাং ভাঙাভাঙি তো অনেক করেছ। এখন এইসব বাদ দাও। টিভি দেখছিলে, টিভি দেখ।

মতিয়ুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, তার মানে?

আনিকা বলল, যা বলেছি তার মানে তোমার না বোঝার কথা না।

তুই মিতুর শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস কি যাচ্ছিস না সেটা বল!

আনিকা বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি। এখন তুমি কী করবে করো। হাতুড়ি নিয়ে আস। ঠ্যাং ভাঙো।

মতিয়ুর রহমান অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে মুখের উপর এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে পারে— তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ঘটনা কী?

আনিকা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো সে বাবার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ তর্ক করতে চায়। মতিয়ুর রহমান মিইয়ে গেছেন। মেয়েকে কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। টিভিতে নতুন একটা রান্নার কথা বলছে— রাশিয়ান সালাদ। সেদিকেও মন দিতে পারছেন না।

মতিয়ুর রহমান ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, অসুস্থ শরীর নিয়ে বেশি ঘোরাঘুরি করা ঠিক না। দু'দিন পর পর জ্বরজ্বারি হয়— এই লক্ষণও ভালো না। লিভারের কিছু হয়েছে কি-না কে জানে! ভালো একজন ডাক্তার দেখা। সবচে' ভালো হলো রেস্টে থাকা।

আনিকা আর কিছু বলল না। বাবার সামনে থেকে বের হলো। তার কোথাও যাবার পরিকল্পনা নেই। এখন মনে হয় মিতুর শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারলে মন্দ হতো না। বাচ্চা একটা মেয়ে বউ সেজে কী করছে দেখে আসা যায়। সমস্যা একটাই— মিতুর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা তার জানা নেই। রাইফেলস স্কয়ারে নাকি সুন্দর দোকানপাট হয়েছে। এখনো সে যায় নি। সেখানে যাওয়া যেতে পারে। কফির দোকান থাকলে এক কাপ কফি কিনে খাওয়া। সবচে' ভালো হয় শওকতের বাসায় চলে যাওয়া। ছেলে তার সঙ্গে থাকতে আসছে, সে কী ব্যবস্থা করেছে দেখে আসা।

সে রিকশা নিল। রিকশায় উঠার পর মনে হলো, কোথাও না গিয়ে কোনো একটা সিনেমাহলে গিয়ে একা একা ছবি দেখলে কেমন হয়! ঠাণ্ডা সিনেমাহলে অনেক লোকের সঙ্গে বসে থাকা। ছবির আজগুবি কাহিনী দেখার মধ্যেও মজা আছে। নায়ক কোনো কারণ ছাড়া গান শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে এক গাদা মেয়ে উপস্থিত হলো। তারাও নাচ শুরু করবে। মন্দ কী ? এই সময়ে সিনেমার কোনো শো আছে কি-না তাও আনিকার জানা নেই।

রিকশাওয়ালা বলল, আপা, কোথায় যাবেন ?

আনিকা বলল, এখনো বুঝতে পারছি না কোথায় যাব। আপনি এগুতে থাকুন। আমি ভেবে-চিন্তে বলব।

রিকশা এগুচ্ছে। মাথার উপর কড়া রোদ। অথচ আনিকার শীত লাগছে। বেশ ভালো শীত লাগছে। সে বুঝতে পারছে তার জ্বর আসছে। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। তার উচিত বাসায় ফিরে যাওয়া— কিন্তু তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। রিকশা চলতে থাকুক। অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক। সে রিকশায় বসেই তার জীবন পার করে দেবে।

ইমন ভেবেছিল প্রথম যখন সে তার বাবাকে দেখবে, চিনতে পারবে না। বাবার চেহারা তার মনে ছিল না। নিউ জার্সির বাড়িতে বাবার ছবি থাকলে সে ছবি দেখে চেহারা মনে করত। কিন্তু সেই বাড়িতে তাঁর কোনো ছবি নেই। মা'র পুরনো অ্যালবামে হয়তো আছে, কিন্তু মা অ্যালবাম তালাবন্ধ করে রাখে। ফ্যামিলি রুমে ফায়ারপ্লেসের পাশে কিছু অ্যালবাম রাখা আছে। সেখানে সবই নতুন ছবি। পুরনো ছবি একটাও নেই।

বাবার কথা মনে হলেই ইমনের চোখে ভাসে তার মুখের কাছে একটা মুখ। মুখটা হাসি হাসি। আর দুটা চকচকে চোখ। চকচকে চোখের ব্যাপারটা নিয়ে ইমন চিন্তা করেছে। মানুষের চোখ কি আসলেই চকচক করে ? রাতেরবেলা হরিণের চোখে আলো পড়লে চোখ নীল রঙের হয়ে যায় এবং ঝিকমিক করতে থাকে। তাদের নিউ জার্সির বাড়ির পেছনের পোর্চে শীতের সময় জঙ্গল থেকে হরিণ আসে। যখন পোর্চের আলো তাদের চোখে পড়ে, তখন তাদের চোখ তারার মতো ঝিকমিক করতে থাকে। মানুষের বেলাতেও কি এরকম হয় ? একবার সে মা'কে জিজ্ঞেস করল। রেবেকা বললেন, তোমার সব উদ্ভট প্রশ্ন। মানুষের চোখ চকচক করবে কেন ?

ইমন বলল, চোখ যখন খুব কাছাকাছি আসে, তখন কি চকচক করে ?

রেবেকা বললেন, যে চোখ দূরে চকচক করে না, সেই চোখ কাছে এলেও চকচক করে না। কেন এমন আজগুবি প্রশ্ন করেছ ?

এমনি।

এমনি না। তুমি বিনা কারণে প্রশ্ন করার ছেলে না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কারণটা বলো।

ইমন কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রেবেকা বললেন, আমি বরং এক কাজ করি। আমার মুখ তোমার মুখের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসি। তুমি দেখ চোখ চকচক করে কি-না।

ইমন বলল, আচ্ছা।

রেবেকা ইমনের খুব কাছাকাছি চলে এলেন। এত কাছে যে তার নাকের গরম নিঃশ্বাস ইমনের গালে লাগতে লাগল। রেবেকা রাগ-রাগ ভঙ্গি সরিয়ে দিয়ে প্রায় আদুরে গলায় বললেন, আমার চোখ কি চকচক করছে ?

না।

তুমি কি তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ ?

হুঁ।

ইমন যদিও বলেছে সে তার প্রশ্নের জবাব পেয়েছে— আসলে কিন্তু পায় নি। তখনো সে ভেবেছে কারো কারো চোখ নিশ্চয় চকচক করে। চকচকে চোখের ইংরেজি হলো— Glittering eyes. Watery eyes না।

ইমন রিকশায় করে তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে। এই প্রথম যে সে রিকশায় চড়ল তা-না। আগেও চড়েছে। দু'বার চড়েছে। সেই দু'বার তার খুবই ভয় লাগছিল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি ছিটকে পড়ে যাবে। এখন কোনো ভয় লাগছে না। এখন তার মনে হচ্ছে ছিটকে পড়ে যাবার মতো কিছু হলে তার বাবা তাকে খপ করে ধরে ফেলবেন।

বাবাকে প্রথম দেখে সে ছোটখাটো একটা চমক খেয়েছে। নিজের উপর খানিকটা তার রাগও লেগেছে। কেন তার এতদিন ধরে মনে হয়েছে সে বাবার চেহারা ভুলে গেছে ? মোটেও ভোলে নি। তা না হলে দেখামাত্র সে কীভাবে চিনল ? তাকে সামনে এসেও দেখতে হয় নি। পেছন থেকে দেখেই সে চিনে ফেলেছে। ইমন সামান্য লজ্জা পাচ্ছিল— বাবা তাকে দেখে কী করেন এই ভেবে লজ্জা। ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু-টুমু খেলে খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। ইমন বড় ধরনের স্বস্তিবোধ করল, যখন সে দেখল তার বাবা সেরকম কিছুই করলেন না। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাবার জন্যে রেডি ?

ইমন বলল, হুঁ।

তোমার মা কই ?

ইমন বলল, মা ছোটখালার বাসায় বেড়াতে গেছেন। আমাকে বলে গেছেন তুমি এলে তোমার সঙ্গে চলে যেতে।

তোমার সঙ্গে কী যাচ্ছে ? অনেক পুটলা-পুটলি দেখছি। দাও কিছু আমার কাছে দাও। তোমার হাতেরটা দাও।

হাতেরটা দেয়া যাবে না।

হাতে কী ?

চাইনিজ লণ্ঠন।

চাইনিজ লণ্ঠনটা তাহলে তোমার হাতেই থাকুক। ব্যাক প্যাকটা আমার কাছে দাও।

বাবার আরেকটা জিনিস ইমনের খুবই ভালো লাগল। তাঁর মধ্যে ন্যাগিং ভাব নেই। সে যখন বলল, হাতের জিনিসটা দেয়া যাবে না, তখন বাবা এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেন নি। অন্য যে কেউ হলে বলত, কেন দেয়া যাবে না ? মা শুধু এই প্রশ্ন করেই চুপ করে থাকত না। মা বলত, দেখি প্যাকেটটা খোল। আমি দেখতে চাই এটা এমন কী মহার্ঘ বস্তু যা আমার হাতে দেয়া যাবে না। 'মহার্ঘ বস্তু' বাক্যটা মা ঘনঘন ব্যবহার করে। মহার্ঘ বস্তুর ইংরেজি হচ্ছে— Valuable goods.

রিকশা বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেল। ইমন সিট থেকে পড়ে যেতে ধরেছিল। শওকত খপ করে তাকে ধরে ফেলল। ইমন মোটেই অবাক হলো না। সে জানত বাবা তাকে কিছুতেই রিকশা থেকে পড়তে দেবেন না।

শওকত বলল, ইমন, তুমি তো বাংলা বেশ ভালো বলতে পার। অল্পবয়েসী বাচ্চারা বিলেত-আমেরিকায় গেলে ইংরেজিটা অতি দ্রুত শেখে। যত দ্রুত শেখে তার চেয়েও দ্রুত গতিতে বাংলা ভুলে যায়। তোমাদের নিউ জার্সির বাড়িতে তুমি কি বাংলায় কথা বলো ?

মা'র সঙ্গে বাংলায় কথা বলি।

বাংলা পড়তে পার ?

পারি। গল্পের বই পড়ি।

সবশেষ বাংলা বই কোনটা পড়েছ ?

বিষের কাঁটা।

লেখকের নাম কি মনে আছে ?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলো কী! এই বই তো বাচ্চাদের জন্যে কঠিন।

কঠিন না— এটা একটা ক্রাইম সলভিং ডিটেকটিভ স্টোরি।

বাংলা বই কি তুমি নিজের আগ্রহেই পড় ? না-কি তোমার মা জোর করে তোমাকে পড়ান ?

প্রথম প্রথম বকা দিয়ে পড়াতেন। এখন নিজেই পড়ি।

আচ্ছা দেখি এখন তোমার বাংলা জ্ঞানের একটা পরীক্ষা হবে। বলো দেখি পানি শব্দটার ইংরেজি কী ?

Water.

হয়েছে, দশে দশ পেয়েছ। বলো জল শব্দের ইংরেজি কী ?

Water.

আবারো হয়েছে, দশে দশ। এখন বলো অম্বু শব্দটার ইংরেজি কী ?

Water.

হয়েছে। এখন পেয়েছ দশে এগারো। এক নাম্বার বেশি দিয়ে দিলাম। দশে এগারো দেবার নিয়ম নেই, তবে আমি পরীক্ষক হিসেবে ভালো। আমি কাউকেই ফেল করাতে চাই না। আমি চাই সবাই পাস করুক। ভালো স্টুডেন্টরা দশে এগারো, বারো পাক।

ইমন মাথা নিচু করে হাসল। শওকত বলল, ইমন শোনো, আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে অম্বু শব্দটার মানে তুমি জানো না। তুমি অনুমানে বলেছ। যেহেতু পর পর দু'টি শব্দের ইংরেজি হলো Water, তুমি ধরেই নিয়েছ পরেরটাও তাই হবে। আমার অনুমান কি ঠিক ?

হুঁ ঠিক।

তাহলে তো তোমাকে দশে এগারো দেয়া যায় না। নাম্বার অনেক কমে যাবে। তোমাকে এখন দিলাম দশে পাঁচ। ঠিক আছে ?

ইমন বলল, না ঠিক নেই।

ঠিক নেই কেন ?

ইমন শান্ত গলায় বলল, আমার উত্তর শুদ্ধ হয়েছে। তুমি সেইভাবে আমাকে নাম্বার দেবে। উত্তর কীভাবে দিয়েছি সেটা চিন্তা করে নাম্বার দেবে না।

তোমার যুক্তি গ্রাহ্য। গ্রাহ্য মানে জানো ? গ্রাহ্য মানে হলো গ্রহণযোগ্য। Accepted. এখন তুমিই বলো দশে তোমাকে কত দিতে হবে ?

আগে যা দিয়েছ তাই। দশে এগারো।

ঠিক আছে তাই দিলাম। দশে এগারো।

থ্যাংক য়্যু।

শওকতের পায়ের কাছে বড় লাল রঙের একটা স্যুটকেস। হাতে ইমনের সবুজ রঙের ব্যাক প্যাক। শওকত ব্যাক প্যাক পায়ের কাছে রেখে বাঁ হাত দিয়ে

ইমনের কোমর চেপে ধরেছে। কিছুটা জায়গা রাস্তা খুব খারাপ। খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। অথচ মাত্র এক সপ্তাহ আগেই নতুন পিচ ঢেলে রাস্তা ঠিক করা হয়েছিল।

শওকত বলল, এ জার্নি বাই রিকশা কেমন লাগছে ?

ভালো লাগছে।

এই ঝাঁকুনি তো ভালো লাগার মতো কিছু না। ভালো লাগছে কেন ?

ইমন বলল, আমি জানি না কেন ভালো লাগছে।

শওকত বলল, সবচে' ভালো রিকশা ভ্রমণের একটা ব্যবস্থা আমি করব। যাতে তুমি যতদিন বেঁচে থাক, ততদিন যেন এই ভ্রমণের কথা তোমার মনে থাকে।

সেটা কেমন ?

আমি কী করব শোন, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খোলা রিকশায় তোমাকে নিয়ে বের হব। রাস্তায় পানি জমে যাবে। পানির ভেতর দিয়ে রিকশা চলবে। তোমার কাছে মনে হবে, তুমি চাক্কা লাগানো নৌকায় চড়েছ। মাথার উপর ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়বে। ঠাণ্ডা বাতাসে তোমার শরীর শিরশির করবে।

ইমন মুগ্ধ গলায় বলল, I think I will like that.

তোমার কি ঠাণ্ডার ধাত আছে ?

ঠাণ্ডার ধাত মানে কী ?

ঠাণ্ডার ধাত হলো অল্পতেই যাদের ঠাণ্ডা লাগে। একটা আইসক্রিম খেলে গলা ফুলে গেল। মাথায় তিন ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল অমনি জ্বর, কাশি। আছে ঠাণ্ডার ধাত ?

আছে।

থাকলে থাকুক, আমরা বৃষ্টিতে ভিজবই।

Ok.

ইমন লক্ষ করল, তার কেন জানি কাঁদতে ইচ্ছা করছে। গলা ভার ভার লাগছে। গলার কাছে কী যেন আটকে আছে। অথচ কাঁদার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। বাবার সঙ্গে রিকশা করে যেতে তার খুবই ভালো লাগছে। আবার একই সঙ্গে কান্নাও পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ ভিজে যাবে। কান্না বন্ধ করার সহজ বুদ্ধি হলো, কঠিন কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা। তেমন কোনো কঠিন বিষয় ইমনের মাথায় আসছে না।

শওকত বলল, চুপ করে আছ কেন ? কথা বলো।

ইমন কোনো কথা বলল না। চুপ করেই রইল। শওকত তাকিয়ে দেখল, ছেলের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। সে কিছু বলল না।

রেবেকা সারাদিন ছেলের টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করেছে। ইমন টেলিফোন করে নি। রেবেকা খোঁজ নিয়েছে ইমনকে তার বাবা বাসা থেকে নিয়ে গেছে সকাল সাড়ে দশটায়। এখন বাজে সন্ধ্যা সাতটা। এর মধ্যে টেলিফোন আসে নি। মোবাইল টেলিফোনে টেলিফোন করার কায়দাকানুন তাকে খুব ভালো করে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। ইমন কোনো বোকা ছেলে না যে ভুলে যাবে। তাকে বারবার বলা হয়েছে— বাবা যে বাসায় থাকে, সেখানে পৌঁছার পরই যেন টেলিফোন করা হয়। ইমন তা করে নি। রেবেকা যা করতে পারে তা হলো— ছেলের টেলিফোনের অপেক্ষা না করে নিজেই কাজটা করা। সেই ইচ্ছাও হচ্ছে না। তার খুবই চিন্তা লাগছে। ছেলেকে নিয়ে চিন্তা না। ছেলে কেন টেলিফোন করছে না— তা নিয়ে চিন্তা।

ইমনের টেলিফোন এলো রাত আটটায়। সারাদিনে সে কোনো টেলিফোন করে নি— এই নিয়ে রেবেকা কোনো কথা বলল না। যেন কিছুই হয় নি সে-রকম গলার স্বর করে বলল, কেমন আছ ইমন ?

ইমন বলল, ভালো।

ফান হচ্ছে ?

হুঁ।

কী ফান হচ্ছে বলো তো ?

ইমন জবাব দিল না। রেবেকা বললেন, সারাদিনে কী কী করলে সেটা বলো।

ইমন এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। রেবেকা শঙ্কিত বোধ করলেন। ছেলে যদি হঠাৎ কথা বন্ধ করে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে সে আর মুখ খুলবে না। সামনে থাকলে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার কথা শুরু করা যেত, এখন সে সামনেও নেই।

রেবেকা ছেলের কথা শুরু করানোর জন্যে বললেন, ইমন, তুমি কি তোমার বাবাকে চাইনিজ লণ্ঠনটা দিয়েছ ?

ইমন বলল, কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি।

দিতে এত দেরি হলো কেন ?

রিকশা থেকে নেমে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। আমি আরেকটা নতুন বানিয়ে কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি।

সারাদিন বসে বসে চাইনিজ লণ্ঠন বানালে ?

হুঁ। বাবা রঙিন কাগজ কিনে আনল। গাম কিনে আনল। মোমবাতি আনল।

সারাদিন লণ্ঠন বানানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলে বলে আমাকে টেলিফোন করতে পার নি। তাই না ?

হ্যাঁ।

তোমার বাবা কি লণ্ঠন দেখে খুশি হয়েছে ?

হুঁ।

সে এখন কোথায় ? কী করছে ?

বাবা এখন আরেকটা লণ্ঠন বানাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হুঁ। আমি তো তিনটা রঙ ব্যবহার করেছি— লাল, সবুজ আর হলুদ। বাবা বলছে তিনটা রঙ ব্যবহার না করে একটা রঙের অনেকগুলি শেড ব্যবহার করে বানালে খুব সুন্দর হবে। যেমন ধরো সবুজ রঙ। বাবা এখন সবুজ রঙের পাঁচটা শেড দিয়ে বানাচ্ছে।

সবুজ রঙের পাঁচটা শেড তুমি পাবে কোথায় ? বাজারে তো একটাই সবুজ রঙের কাগজ পাওয়া যায়।

সবুজ রঙের পাঁচটা শেড বাবা রঙ গুলে বানিয়েছে।

ও আচ্ছা, তোমার বাবা তো একজন পেইন্টার। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

ইমন বলল, মা, আমি এখন রাখি। বাবাকে সাহায্য করতে হবে। বাই।

রেবেকা কিছু বলার আগেই ইমন টেলিফোন রেখে দিল। খুব জরুরি প্রশ্ন রেবেকার করা হলো না— আজ দুপুরে সে কী খেয়েছে ? খাবারটা কি ঘরে তৈরি হয়েছে, না বাইরে থেকে এসেছে ?

শওকত খুব মন দিয়েই চাইনিজ লণ্ঠন বানাচ্ছে। ফ্রেম তৈরি হয়ে গেছে, এখন শুধু ফ্রেমে সবুজ রঙের কাগজ বসানো। ইমন আগ্রহ নিয়ে বাবার কাজ দেখছে। সে হাঁটু গেড়ে বাবার সামনে বসে আছে। তার হাতে আইকা গামের কৌটা। তার কাজ হচ্ছে কাগজে আইকা গাম লাগিয়ে দেয়া।

ইমন!

হুঁ।

আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কী আইডিয়া ?

সবুজ রঙের উপর লাল রঙের একটা ফিগার আঁকব। সবুজের মধ্যে লাল খুব ভালো ফোটে। আমি কী করব শোন, যেখানে গাঢ় সবুজ রঙের কাগজ, সেখানে ফিগারটা আঁকব হালকা লাল রঙে। আবার যেখানে হালকা সবুজ রঙ ব্যবহার করেছি, সেখানে ফিগার আঁকা হবে গাঢ় লাল রঙে। এতে কী হবে জানো ?

কী হবে ?

লাল রঙের ইনটেনসিটি সমান মনে হবে। ফিগারটা থ্রি ডাইমেনশনাল হয়ে যাবে। লণ্ঠন জ্বালালে মনে হবে ফিগারটা লণ্ঠন থেকে বাইরে চলে এসেছে।

সত্যি ?

আমার এরকম মনে হচ্ছে। শেষ না হলে বুঝতে পারব না।

কখন শেষ হবে ?

বুঝতে পারছি না। সময় লাগবে।

আমি কিন্তু জেগে থাকব।

আচ্ছা। ইমন, তুমি কি চা বানাতে পার ?

না।

এসো তোমাকে চা বানানো শিখিয়ে দেই। এখন তোমার কাজ হবে মাঝে-মাঝে চা বানিয়ে আমাকে খাওয়ানো। পারবে না ?

পারব। আমি মিল্ক শেক বানাতে পারি।

মিল্ক শেকের মতো জটিল বস্তু যে বানাতে পারে, চা বানানো তার কাছে কিছুই না। চা বানানো তার কাছে লেনটিল-রাইস।

লেনটিল-রাইস মানে কী ?

লেনটিল-রাইস মানে হলো ডাল-ভাত। এটা একটা বাংলা বাগধারা। যার অর্থ খুবই সহজ কাজ। খুবই সহজ কাজের ইংরেজি বাগধারা কী ?

ইমন বলল, A piece of cake.

জীবনের প্রথম চা ইমন বানাল রাত ন'টায়। তার কাছে মনে হলো, প্রথম কাপ চা বানিয়ে সে হঠাৎ অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। শওকত চায়ে চুমুক দিয়ে

বলল, প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে চলে। তবে তেমন ভালো হয় নি। দুধ বেশি হয়েছে। চিনিও বেশি হয়েছে। আমার ধারণা পরের বার থেকে ঠিক হয়ে যাবে।

ইমন লক্ষ করল, তার বাবার সঙ্গে তার মায়ের একটা বড় ধরনের অমিল আছে। ইমনের বানানো প্রথম চা যত খারাপই হোক, মা চুমুক দিয়েই বলত— অসাধারণ হয়েছে। আমি আমার জীবনে এত ভালো চা খাই নি। বাবা সে-রকম বলে নি। তার অর্থ হলো— বাবা যখন বলবে চা ভালো হয়েছে, তখন ধরে নিতে হবে চা ভালো হয়েছে।

ইমন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন বাবা আবার চা খেতে চাইবে। সে বানাবে। এবারের চায়ে দুধ এবং চিনি কম দিতে হবে। চাইনিজ লণ্ঠনের নির্মাণ থেকে ইমনের আগ্রহ এখন অনেক কমে গেছে। এখন তার আগ্রহ চা বানানোতে।

আনিকা চিন্তাই করতে পারে নি, আজও তার অফিসে পৌঁছাতে দেরি হবে। অন্যদিনের চেয়ে দশ মিনিট আগে সে ঘর থেকে বের হয়েছে। সেই হিসাব ধরলে পনেরো মিনিট আগে অফিসে পৌঁছানোর কথা, অথচ এলিফ্যান্ট রোডের জ্যামে সে চল্লিশ মিনিট ধরে আটকা পড়ে আছে। জ্যামের কারণ রাস্তার মাঝখানে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে একটি ট্রাক। ট্রাকের পাশের খালি জায়গাটা দিয়ে এক সঙ্গে দু'টা গাড়ি ঢুকতে গিয়ে গিট্টু লেগে গেছে। কেউ নড়তে পারছে না। কারো তেমন মাথাব্যথাও নেই। সবাই গা ছেড়ে অপেক্ষা করছে। কিছু একটা হবে। কখন হবে কীভাবে হবে সেটা নিয়ে কারো কোনো টেনশন দেখা যাচ্ছে না। ফ্লাস্কে করে এক ছেলে রঙ চা বিক্রি করছে। অনেকেই আগ্রহ করে সেই চা খাচ্ছে।

ছেলেটা আনিকার কাছে এসে বলল, আফা, চা খাইবেন ?

আনিকা বলল, যা ভাগ। থাপ্পড় খাবি।

আনিকা ভেবেই পাচ্ছে না ফট করে থাপ্পড় দেবার কথাটা সে কেন বলল! তার মেজাজ কি এতটাই খারাপ হয়েছে ? প্রতি সপ্তাহে তার দুই-তিনদিন লেট হচ্ছে। অন্যদেরও লেট হচ্ছে। অন্যদেরটা কারোর চোখে পড়ছে না। তারটা চোখে পড়ছে। সেকশান অফিসার সিদ্দিক সাহেব গতকাল খুব ভালো মানুষের মতো তার ঘরে এসে বললেন, মিস আনিকা, আপনি কি দুই আড়াইশ' টাকা খরচ করতে পারবেন ?

আনিকা তটস্থ হয়ে বলল, কোন ব্যাপারে স্যার ?

একটা দেয়ালঘড়ি কিনে আপনার শোবার ঘরে টানিয়ে রাখবেন। আজকাল দেয়ালঘড়ি সস্তা হয়ে গেছে। দুই আড়াইশ' টাকায় ভালো ঘড়ি পাওয়া যায়। আমার ধারণা আপনার বাসায় কোনো দেয়ালঘড়ি নেই।

অপমানে আনিকার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে চোখের পানি আটকে রেখে বলল, এইবার বেতন পেয়েই একটা ভালো ঘড়ি কিনব স্যার।

জ্যাম বোধহয় ছুটেছে। সব গাড়ি একসঙ্গে চলা শুরু করেছে। এতক্ষণ কারো কোনো ব্যস্ততা ছিল না। এখন ব্যস্ততার সীমা নেই— কে কার আগে যাবে! যেন অলিম্পিকের দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ফার্স্ট হয়ে সোনা জিততে হবে।

এক ঘণ্টা বাইশ মিনিট লেট করে আনিকা অফিসে পৌঁছল।

সিদ্দিক সাহেব আজ কী বলবেন কে জানে! আজ হয়তো বলবেন— মিস আনিকা, আপনাকে অফিসের খরচে একটা ঘড়ি কিনে দেই ?

শান্ত গলায় কঠিন অপমানের কথা একটা মানুষ কী করে বলে কে জানে! আনিকার ইচ্ছা করছে অফিসে না ঢুকে বাসায় চলে যেতে। পর পর তিনদিন বাসায় কাটিয়ে অফিসে হাজির হবে। যার যা ইচ্ছা বলুক।

যা ইচ্ছা করে তা করা যায় না। মানুষ চলে অনিচ্ছার পথে। তাকে বাধ্য হয়ে চলতে হয়। আনিকা তার ঘরে ঢুকল। তার ঘরে সে একা না, আরেকজন সিনিয়র কলিগ আছেন। জাহানারা। অফিসে তার নাম 'পান আপা'। তিনি সারাক্ষণ পান খান। শুধু যে নিজে খান তা না, অন্যদেরও খাওয়াবার চেষ্টা করেন। ময়মনসিংহের মিকচার জরদা, মহেশখালির পান।

জাহানারা আনিকাকে দেখে কেমন যেন অন্যরকম চোখে তাকাল।

আনিকার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। আজ মনে হয় বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

আনিকা বলল, আপা কেমন আছেন ? আজ দেরি হয়ে গেল। কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল ?

জাহানারা শুকনা গলায় বললেন, বড় সাহেব দু'বার এসে খোঁজ করেছেন। তোমাকে দেখা করতে বলেছেন।

আনিকা ঢোঁক গিলল। আজ ভালো যন্ত্রণা হবে। এখনো সময় আছে চেয়ারে না বসে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেই হয়। তিনদিন বাসায় শুয়ে বসে থাকবে। বেইলী রোডে নাটক পাড়ায় নাটক দেখবে, ফুচকা খাবে। একদিন যাবে শওকতের বাসায়। শওকত তার ছেলেকে নিয়ে কী আহ্লাদী করছে দেখবে। ছেলের জন্মদিনে শওকত কি তাকে ডাকবে ? মনে হয় ডাকবে না। ডাকুক বা না ডাকুক, জন্মদিনের একটা উপহার তো কিনতে হবে। ছেলেদের উপহার কেনার যন্ত্রণা আছে। একটা দিন লাগবে উপহার বেছে বের করতে। যত কিছুই সে ভাবুক, শেষপর্যন্ত বড় সাহেবের কামরায় তাকে ঢুকতেই হবে। সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় নিজের স্বাধীনতায় সে আজ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি।

সিদ্দিক সাহেব আনিকাকে দেখে বললেন, ও আচ্ছা আপনি এসেছেন। বসুন বসুন।

আনিকা বসল।

সিদ্দিক সাহেব তার সামনের খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললেন, আজকের কাগজ দেখেছেন ? জোকস কর্নারে মজার একটা জোক ছাপা হয়েছে। টিচার ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছে— ঘোড়া এবং হাতি, এদের পার্থক্য কী ? ছাত্র বলেছে, ঘোড়ার লেজ পেছনে থাকে, হাতির লেজ সামনে থাকে। হা হা হা। এইসব জোকস এরা কোথায় পায় কে জানে!

আনিকা অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর আচার-আচরণের কোনো মানে সে বুঝতে পারছে না।

মিস আনিকা!

জি স্যার।

আপনার কী রাশি বলুন তো।

তুলা রাশি। লিবরা।

আজকের দিনে আপনার রাশিফল কী বলছে দেখি— তুলা রাশি : বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকুন। দূরপাল্লার ভ্রমণে বের হবেন না। চাকরি ও ব্যবসায় আর্থিক গোলযোগের সম্ভাবনা। আপনি কি রাশিফলে বিশ্বাস করেন ?

আনিকা বলল, আমি বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না।

সিদ্দিক সাহেব হাসিমুখে বললেন, আমিও বিশ্বাস করি না, তবে আমার বেলায় খুব মিলে। আমি পত্রিকা খুলে প্রথম পড়ি রাশিফল। তারপর পড়ি জোকস, তারপর ফ্রন্ট পেইজে যাই।

আনিকা বুঝতে পারছে না এই মানুষটার সমস্যা কী ? হড়বড় করে এত কথা কেন বলছে! কোনো একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে। ঘটনাটা কী ?

মিস আনিকা!

জি স্যার।

আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। সুসংবাদ এবং সারপ্রাইজ। বিগ সারপ্রাইজ। চা খাবেন ?

জি-না স্যার, চা খাব না। সারপ্রাইজটা কী ?

আপনার প্রমোশন হয়েছে। আমাদের চাকরিতে প্রমোশন তো রেয়ার ঘটনা। দশ বছর বার বছর একই পোস্টে ঘটরঘটর করেও কিছু হয় না। আপনার ভাগ্য খুবই ভালো। কনগ্রাচুলেশনস।

আনিকা হতভম্ব হয়ে গেল। তার প্রমোশন হয়েছে। তার মানে সে এখন সিদ্দিক সাহেবের র‍্যাংকের একজন। অফিসের গাড়ি তাকে নিয়ে আসবে, দিয়ে আসবে। অফিসের কোয়ার্টারের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সম্পূর্ণ তার নিজের আলাদা একটা ঘর হবে। ঘরের সামনে টুলের উপর পিওন বসে থাকবে।

মিস আনিকা!

জি স্যার।

আপনি কি খুশি হয়েছেন ?

অবশ্যই খুশি হয়েছি। খুশি হবো না কেন ? এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

কল্পনার বাইরে থাকবে কেন ? আপনি দু'টা সেকশনাল পরীক্ষাতেই খুব ভালো করেছেন। আপনি কাজ-কর্মেও স্মার্ট। আপনার রেকর্ডস তো খুবই ভালো। আমাদের মিষ্টি কবে খাওয়াবেন ?

আজই খাওয়াব।

আজকের দিনটা ছুটি নিয়ে বাসায় যান। আত্মীয়স্বজনদের সুসংবাদটা দিন।

আনিকা চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হলো। এই আনন্দের খবরটা প্রথমেই শওকতকে দিতে ইচ্ছা করছে। সে কি মিষ্টি নিয়ে শওকতের বাসায় যাবে ? শওকত যখন বলবে, মিষ্টি কিসের ? সে বলবে, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে তার মিষ্টি। আমার চাচাশ্বশুর আমাকে দেখতে এসেছিলেন, তার মিষ্টি।

শওকতের বাসায় যাওয়া যাবে না। মিতুর শ্বশুরবাড়িতে অবশ্যি যাওয়া যায়। মিতুর বরের জন্যে একটা পাঞ্জাবি, এক প্যাকেট মিষ্টি।

আনিকা নিজের ঘরে ঢুকল। জাহানারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কী লজ্জার ব্যাপার! দীর্ঘদিনের সহকর্মী আজ তাকে দেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আনিকার লজ্জা লাগছে, আবার খুব ভালোও লাগছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। আজ ছুটি নেয়াই ভালো। প্রমোশন পেয়ে একজন একটু পর পর আনন্দে কাঁদছে— এই দৃশ্য দেখে সবাই আড়ালে হাসাহাসি করবে। সে এখন একজন ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার। তাকে নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করার সুযোগ সে দেবে না।

প্রমোশনের খবর মনে হয় সবাই জেনে গেছে। অফিস থেকে বের হতেই কারপুলের এক ড্রাইভার ছুটে এসে বলল, আপা, কোথায় যাবেন ?

আনিকা বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না, বাসায় চলে যাব।

. ড্রাইভার বলল, একটু দাঁড়ান আপা, গাড়ি নিয়ে আসি।

আনিকা বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। 'না না গাড়ি লাগবে না' এই বলে সে কি হাঁটতে শুরু করবে ? না-কি বলবে, 'আমাকে একটা রিকশা ডেকে দিন। তাতেই হবে।'

আনিকা তার অফিসের গাড়িতে বসে আছে। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! কোনো বিস্ময়ই মানুষ একা নিতে পারে না। আনিকার এমনই কপাল, তার জীবনের সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা সে আর কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে নি।

কত নাটকীয় ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে! এমন কি হতে পারে না হঠাৎ তার চোখে পড়বে রাস্তার এক মাথায় শওকত দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, এই জায়গায় এসে তাদের গাড়ি জ্যামে আটকা পড়ল। গাড়ির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে আনিকা ডাকল। শওকত অবাক হয়ে কাছে এসে বলবে, সরকারি গাড়ি দেখছি! তুমি গাড়ি পাও জানতাম না তো! আনিকা তখন অবহেলার ভঙ্গিতে বলবে, আগে পেতাম না, এখন প্রমোশন হয়েছে। এখন পাচ্ছি।

প্রমোশন আবার কবে হলো ?

বাদ দাও তো, প্রমোশন কবে হলো সেই আলাপ এখন করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি সিগারেট ফেলে গাড়িতে উঠে আস।

আনিকা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। গাড়িতে উঠে আসতে বলাটা মনে হয় ঠিক হবে না। সরকারি গাড়িতে বাইরের লোক তোলার নিয়ম নিশ্চয়ই নাই।

ড্রাইভার বলল, আপা, আপনার বাসা কোন দিকে ?

আনিকা বলল, বাসায় যাব না। আপনি একটা কাজ করুন, আমাকে নিউমার্কেটের গেটে নামিয়ে দিয়ে চলে যান। আমি কয়েকটা ওষুধ কিনব।

আমি অপেক্ষা করি ?

আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে আপনি চলে যাবেন। আমার দেরি হবে।

প্রথমেই আনিকা কয়েকটা গানের ক্যাসেট কিনল। তার মধ্যে নজরুলগীতির একটা ক্যাসেট আছে। সেখানে 'মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম'

গানটা আছে। ক্যাসেটগুলি কেনার পর পরই মনে হলো— শুধু শুধু টাকাগুলি নষ্ট করেছে। তাদের বাসায় ক্যাসেট শোনার কোনো যন্ত্র নেই। আনিকার সামান্য মন খারাপ হলো। অকারণে টাকা নষ্ট করতে তার মায়া লাগে। সে বেশ কৃপণ মেয়ে।

আজকের শুভদিনটা মনে রাখার জন্যে শওকতের জন্যে কিছু কেনা দরকার। দামি কিছু না। দুই আড়াইশ' টাকার মধ্যে কিছু। একটা শার্ট কেনা যেতে পারে। আজকাল কাপড়-চোপড় সস্তা হয়েছে। দুই আড়াইশ' টাকায় ভালো শার্ট পাওয়া যায়।

অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা শার্ট আনিকার পছন্দ হলো। দাম তিনশ' পঞ্চাশ টাকা। ফিক্সড প্রাইসের দোকান। এক টাকাও কমাবে না। তিনশ' টাকায় শার্টটা কেনার সে অনেক চেষ্টা করল। দোকানদার রাজি হলো না।

আনিকা ঠিক করল শওকতকে কিছু না দিয়ে তার ছেলের জন্যে উপহার কিনবে। শওকতের জন্যে শার্টের বাজেট ছিল আড়াইশ' টাকা। তার সঙ্গে আরো আড়াইশ' যোগ করে পাঁচশ' টাকা হবে। পাঁচশ' টাকার মধ্যে কিছু। যে ছেলে আমেরিকার মতো জায়গায় বড় হয়েছে, তাকে নিশ্চয়ই এক-দেড়শ' টাকার খেলনা দেয়া যায় না।

আনিকা অনেকগুলো দোকানে ঘুরল। কোনো কিছুই মনে ধরছে না। একটা কচ্ছপ শুধু পছন্দ হয়েছে। কচ্ছপটা সারাক্ষণ শুধু মাথা দোলায়। রঙ-বেরঙের কচ্ছপ কোনো কারণ ছাড়াই মাথা দোলাচ্ছে। দেখতে মজা লাগে। কচ্ছপটার দাম মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা। এত কম দামি জিনিস বিদেশী ছেলেকে উপহার দেয়া ঠিক না। আরো ভালো কিছু দেখতে হবে। জিনিসটা দেখতে সুন্দর হবে। দাম পাঁচশ' টাকার মধ্যে থাকবে।

দুপুর দু'টা পঁচিশ মিনিটে আনিকা নিউমার্কেট থেকে বের হলো। তার হাতে কচ্ছপ। একশ' পঁচিশ টাকা দামের কচ্ছপ তাকে দোকানি দিয়েছে নব্বুই টাকায়।

নিউমার্কেটের গেট থেকে বের হবার পরপরই একটা ইয়েলো ক্যাব এসে তার গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ড্রাইভার মুখ বের করে বলল, আপা আমাকে চিনেছেন?

আনিকা বলল, হ্যাঁ চিনেছি।

কেমন আছেন আপা?

ভালো।

কোথায় যাবেন ? উঠেন গাড়িতে উঠেন।

কোনো কথা না বলে আনিকা গাড়িতে উঠল। ড্রাইভার বলল, বাসায় যাবেন, না ঐ দিনের মতো কিছুক্ষণ ঘুরবেন ? আনিকা বলল, আপনার গাড়িতে কি এসি আছে ? এসি থাকলে কিছুক্ষণ ঘুরব।

এসি আছে। নতুন গ্যাস ভরেছি, ভালো ঠাণ্ডা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন গাড়ির মধ্যে মাঘ মাস।

গাড়িতে ক্যাসেটপ্লেয়ার আছে ? ক্যাসেটপ্লেয়ার থাকলে গান শুনব। আমি ক্যাসেট কিনে এনেছি।

ক্যাসেটপ্লেয়ার নষ্ট। ঠিক করব ঠিক করব বলে ঠিক করা হয় না। টেক্সিক্যাবে সবাই এসি চায়। কেউ গান শুনতে চায় না। টেক্সিক্যাবে উঠে গান শুনবে এত সৌখিন মানুষ বাংলাদেশে নাই। বিলেত-আমেরিকায় থাকলে থাকতে পারে।

আপনি কথা কম বলে গাড়ি চালান। আপনি কথা বেশি বলেন।

ড্রাইভার বলল, একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করব, তারপর আর কিছু জিজ্ঞেস করব না। ফাঁকা রাস্তায় যতক্ষণ বলেন ঘুরব।

আনিকা বলল, কথাটা কী ?

উনার সঙ্গে কি পরে দেখা হয়েছে ?

কার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ঐ যে ভদ্রলোক যাকে বিয়ে করতে গেলেন। কাজি অফিসের সামনে থেকে ঐ লোক ছুটে গেল। আমার পরিবারকে ঘটনাটা বলেছিলাম, সে মনে খুবই কষ্ট পেয়েছে।

আপনি অনেক কথা বলে ফেলেছেন, আর কথা বলবেন না।

জি আচ্ছা।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?

একটা মেয়ে, ক্লাস টুতে পড়ে।

মেয়ের নাম কী ?

উজ্জলা।

উজ্জলা আবার কেমন নাম ?

মেয়ের গায়ের রঙ উজ্জ্বল, এই জন্যে তার মা শখ করে নাম রেখেছে উজ্জলা। ভালো নাম মুসাম্মত উজ্জলা বেগম।

আনিকা হাতে ধরে রাখা কচ্ছপটা ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, এই কচ্ছপটা রাখুন। উজ্জলাকে দেবেন। আমার উপহার। আর শুনুন, এখন থেকে কোনো কথা বলবেন না। মুখ বন্ধ করে গাড়ি চালাবেন। একটা শব্দ যদি বলেন, আমি গাড়ি থেকে নেমে যাব। শব্দও বলতে হবে না, গলা খাঁকারি দিলেও নেমে যাব।

গাড়ির এসি সত্যি ভালো। আনিকার এখন শীত শীত লাগছে।

একটা পাতলা সুতির চাদর থাকলে ভালো হতো। সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা। গাড়ির ক্যাসেটপ্লেয়ারটা ভালো থাকলে গান শোনা যেত— 'মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম।' হাত প্রেমে ধরতে হয়। অপ্রেমে হাত ধরা যায় না। সে যে শওকতের হাত ধরে আছে, সেই হাত কি প্রেমে ধরে আছে, না অপ্রেমে ধরে আছে? ইদানীং তার খুব ঘনঘন মনে হচ্ছে— শওকত নামের মানুষটার প্রতি তার কোনো প্রেম নেই। যা আছে তা অন্য কিছু। এই অন্য কিছুটা কী তা সে জানে না। খুব বুদ্ধিমান কোনো মানুষের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত, তাকে সে জিজ্ঞেস করত। মিসির আলির মতো বুদ্ধিমান কেউ। যিনি একটা দু'টা প্রশ্ন করেই সব জেনে ফেলতেন। কিংবা তাঁকে প্রশ্নও করতে হতো না। তিনি চোখের দিকে তাকিয়েই বলে ফেলতেন।

আনিকা পা উঠিয়ে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে গুটিসুটি মেরে বসল। চোখ বন্ধ করল। এখন কেন জানি তার মনে হচ্ছে গাড়িতে গান বাজছে। এটা মন্দ না। গান হচ্ছে কল্পনায়।

কল্পনায় গান শুনতে শুনতে মিসির আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলা যায়। দেখা যেতে পারে এই বৃদ্ধ তার সমস্যার সমাধান করতে পারেন কি-না। সে কী জন্যে শওকত নামের মানুষটার সঙ্গে ঝুলে আছে। মিসির আলী প্রশ্ন করছেন, সে জবাব দিচ্ছে।

প্রশ্ন : উনার সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

উত্তর : অনেক দিনের।

প্রশ্ন : শোন আনিকা, তুমি এক-দুই শব্দে প্রশ্নের জবাব দেবে না। এক-দুই শব্দে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় পুলিশের কাছে। আমি পুলিশ না। আমার প্রশ্নের জবাব বিস্তারিতভাবে দেবে। সেই বিস্তারিত জবাব থেকে অনেক কিছু বের হয়ে আসবে। এখন বলো, শওকত নামের মানুষটার সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয় এবং কীভাবে পরিচয়?

উত্তর : আমার বড়ভাই এবং উনি এক ক্লাশে পড়তেন। দু'জনের মধ্যে খুবই

বন্ধুত্ব ছিল। তারা দু'জন এক সঙ্গে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। উনি ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাকে চিনি।

উনার বিষয়ে আপনাকে একটা মজার কথা বলি— পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাঁকে আমি নাম ধরে ডাকতাম। ভাইয়া তাঁকে ডাকত শওকত। আমিও ডাকতাম শওকত। হয়তো কোনো একদিন উনি বাসায় এসেছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে ভাইয়াকে বলতাম— ভাইয়া, শওকত এসেছে। ভাইয়া আমাকে বকাবকি করত। বলত, নাম ধরে ডাকছিস কেন ? আমি বলতাম, তুমিও তো নাম ধরেই ডাক। একটু বড় হবার পর আমি শওকত ভাই ডাকা শুরুর চেষ্টা করি; তখন উনি বললেন, বাচ্চা একটা মেয়ে আমাকে নাম ধরে ডাকে, আমার খুব মজা লাগে। তুমি আমাকে নাম ধরেই ডাকবে।

প্রশ্ন : তোমার বড়ভাইয়ের প্রসঙ্গে বলো।

উত্তর : উনি আমার আপন ভাই ছিলেন না। উনি ছিলেন আমার সৎভাই। উনার মা'র মৃত্যুর পর বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ভাইয়া আমাকে খুব আদর করতেন। আমার ভাইয়া আমাকে যে আদর করতেন, পৃথিবীর কোনো ভাই তার বোনকে এত আদর কখনো করে নি, ভবিষ্যতেও করবে না।

প্রশ্ন : উনি মারা গেছেন ?

উত্তর : জি, উনি মারা গেছেন। আমি তখন সেভেনে পড়ি।

প্রশ্ন : তোমার ভাই কীভাবে মারা গেছেন ?

উত্তর : সেটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি না।

প্রশ্ন : অপঘাতে মারা গেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, অপঘাতে মারা গেছেন। ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন। আমার বাবা-মা দু'জনই ভাইয়াকে খুব যন্ত্রণা দিতেন। সারাক্ষণ বকাবকি, সারাক্ষণ রাগারাগি। ভাইয়ার আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়াটা বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। বাবা বলতেন, সব বখাটেরা আর্ট কলেজে পড়তে যায়। এটার নাম আর্ট কলেজ না, এটার নাম বখাটে কলেজ। বাবা তাঁর কলেজে পড়ার খরচ দেয়া বন্ধ করে দিলেন। তখন শওকত তাঁর কলেজের বেতন দিত। রঙ-তুলি কিনে দিত। শওকতের অবস্থা তো ভালো ছিল না। তারও খুব কষ্ট হতো। শেষে ভাইয়া কলেজ ছেড়ে দিল। দিনরাত বসে বসে থাকত। তখন তার মধ্যে সামান্য মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। রাত জেগে ছবি আঁকত। ছবির মানুষগুলির সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলত।

প্রশ্ন : কী কথা ?

উত্তর : কী কথা বলত আমার মনে নেই। সারারাত জেগে জেগে ছবি আঁকত আর কথা বলত— এইটা মনে আছে। তারপর একদিন বাবাকে লম্বা একটা চিঠি লিখে সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরে গেল।

প্রশ্ন : সেই চিঠিতে কী লেখা ?

উত্তর : কী লেখা আমি বলতে পারব না। বাবা সেই চিঠি কাউকে পড়তে দেন নি। মিসির আলী সাহেব শুনুন, আমি কিন্তু ভালো মেয়ে না। আমি খুব খারাপ মেয়ে। আমি কতটা খারাপ আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। ভাইয়ার মৃত্যুর পর আমি ঠিক করেছিলাম— দোকান থেকে ইঁদুর মারা বিষ কিনে এনে চিনি দিয়ে শরবত বানিয়ে বাবা-মা দু'জনকেই খাওয়াব। শুধু যে চিন্তা করেছিলাম তা না, বিষ কেনার জন্যে ঘর থেকে বেরও হয়েছিলাম। শুনুন, আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ব। খুব ঘুম পাচ্ছে। যতটুকু শুনেছেন সেখান থেকে অ্যানালাইসিস করে কিছু বলতে পারবেন ?

মিসির আলী : পারব। শওকত নামের মানুষটির প্রতি তোমার কোনো প্রেম নেই। তুমি তাঁর হাত ধরেছ অপ্রেমে। তোমার ভাইয়ার প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড আবেগ এবং ভালোবাসা ছিল, সেই আবেগ আর ভালোবাসাই তুমি ভাইয়ার বন্ধুর দিকে ছড়িয়ে দিয়েছ। বাবার মৃত্যুর পর মানুষজন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফাদার ফিগার খোঁজার জন্যে। তুমি ব্যস্ত হয়েছ ব্রাদার ফিগারের জন্যে।

উত্তর : আপনি কিছুই জানেন না। শওকত যেদিন বিয়ে করলেন, সেদিন সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি কোনো কিছু মুখে দেই নি। রাত এগারোটার সময় আমি এক গ্লাস পানি খাই আর তার সঙ্গে নয়টা ঘুমের ওষুধ খাই। ভাইয়া যে ওষুধগুলি খেয়েছিল সেই ওষুধ। আমি খুব আনলাকি মেয়ে তো, ওষুধ খাবার পরও আমার মৃত্যু হয় নি। আমি খুব আনলাকি মেয়ে সেই জন্যেই আমি বেঁচে যাই। আমাকে কেউ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় নি। স্টোমাক ওয়াশ করে নি। তিন-চারদিন বিছানায় আধমরার মতো পড়ে থেকে সুস্থ হয়ে উঠি। তারপর যে কাজটা করি তা হলো— শওকতের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হই। তাঁকে বলি, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। তুমি অবশ্যই আমাকে বিয়ে করবে। উনি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এরকম ছটফট করছ কেন ? বসো তো। ঠাণ্ডা হয়ে বসে কথা বলো। চা খাবে ? আমি চা বানিয়ে আনি, চা খাও।

মিসির আলী : তুমি যখন কথা বললে, তখন শওকত সাহেবের স্ত্রী বাসায় ছিলেন না ?

উত্তর : না, ছিলেন না। আর থাকলেও আমি তাঁর সামনেও এই কথাগুলি বলতাম। এখন বুঝেছেন আমি যে শওকতের হাত ধরেছি তা অপ্রেমে ধরি নি। প্রেমেই ধরেছি। এখন আপনি বিদেয় হন। ফুটেন। আপনার সঙ্গে বকবক করে আমার মাথা ধরে গেছে।

আনিকার চোখ বন্ধ। মাথার যন্ত্রণার জন্য মদিনাবাসীর গান শুনতে ভালো লাগছে না। আনিকা চোখ মেলে বিরক্ত গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, ক্যাসেটটা বন্ধ করেন তো।

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, আপা, ক্যাসেট তো বাজতেছে না। ক্যাসেটপ্লেয়ার নষ্ট।

ইমন তার বাবাকে বই পড়ে শোনাচ্ছে। বইটার নাম Fear at Midnight. ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প। ফিফথ গ্রেডের কিছু ছেলেমেয়ে মন্টানার জঙ্গলে সামার ক্যাম্প করতে যায়। সেখানে পৌঁছার পর শুরুটা তারা খুবই আনন্দে কাটায়। সমস্যা শুরু হয় মধ্যরাত থেকে। লেক থেকে উঠে আসে এক বুড়ো। বুড়োর চেহারায় মায়া। কথাবার্তায় মায়া। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার চোখ ধ্বক করে ওঠে। তখন চোখের মণিতে হালকা নীল আলো দেখা যায়।

ভূতের গল্প পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। টেবিলে চারটা বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো ছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। ফ্যান বন্ধ রাখা হয়েছে। ফ্যানের বাতাসে মোমবাতি নিভে যায়। তবে আজ গরম নেই। সন্ধ্যাবেলা তুমুল বৃষ্টি হওয়াতে আবহাওয়া ঠাণ্ডা।

ইমন খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ছে। অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হওয়ায় তার নিজেরই খানিকটা ভয়-ভয় লাগছে। গলাও শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির গ্লাসে পানি রাখা আছে। ইমন মাঝে-মাঝে পানির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। পানি খাবার সময়ে কিছুক্ষণ পাঠের বিরতি হয়। তখন পিতা-পুত্র গল্প করে।

এখন পানি পানের বিরতি। শওকত বলল, বুড়ো যে লোক লেকের পানি থেকে উঠে এলো, সে আসলে কে? মানুষ নিশ্চয়ই না?

ইমন বলল, মানুষ না।

সে কি ভ্যাম্পায়ার জাতীয় কিছু?

না। ভ্যাম্পায়াররা পানিতে থাকে না। তারা থাকে পুরনো অন্ধকার বাড়ির কফিনের ভেতর।

তাহলে বুড়োটা কী?

ইমন বলল, বুড়োটা কী আমি জানি। কিন্তু আগেই তোমাকে বলে দিলে মজা নষ্ট হয়ে যাবে।

শওকত বলল, তাহলে থাক। আমার নিজের ধারণা— সে পানির কোনো ভূত।

ইমন বলল, You are very close.

বুড়োটার একটা ছবি আঁকলে কেমন হয় ?

খুব ভালো হয় বাবা।

জোছনা রাতে পানি থেকে উঠে আসছে আলখাল্লা পরা এক বুড়ো।

ইমন আগ্রহ নিয়ে বলল, কখন আঁকবে বাবা ?

গল্পটা শেষ হোক।

ইমন বলল, বাকি গল্পটা আমি অন্য আরেকদিন পড়ব। আমার ছবি আঁকা দেখতে ইচ্ছা করছে।

শওকত বলল, ছবি আঁকা তো দেখতে পারবে না। কেউ তাকিয়ে থাকলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।

তাহলে আমি তাকিয়ে থাকব না। আমি অন্য কিছু করব।

অন্য কিছুটা কী ?

নকল পার্ল তৈরি করব।

কীভাবে ?

এক বাটি ঠাণ্ডা পানি নিতে হবে। জ্বলন্ত মোমবাতি সেই পানির উপর এমনভাবে ধরতে হবে যেন গলানো মোম পানির উপর পড়ে। এক এক ফোঁটা মোম পড়বে আর জমে গিয়ে মুক্তার দানার মতো হয়ে যাবে।

বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

আমাকে আর্টস এন্ড ক্রাফট ক্লাসে শিখিয়েছে।

আসো, তাহলে কাজ শুরু করা যাক। তুমি বানাবে মুক্তা, আমি বানাবো ভূত। তার আগে তুমি মা'র সঙ্গে কথা বলে এসো। সে নিশ্চয়ই তোমার টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

ইমন বাধ্য ছেলের মতো মা'কে টেলিফোন করতে গেল। শওকত লক্ষ করল, টেলিফোন করার জন্যে সে বারান্দায় চলে গেছে। মা'কে সে কখনো বাবার সামনে টেলিফোন করে না। মা'র জগতটা সে বাবার কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে। একইভাবে বাবার জগতটাও সে নিশ্চয় মা'র কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মাতা-পুত্রের কথাবার্তা আড়াল থেকে শোনার ক্ষীণ ইচ্ছা শওকতের হলো। ইচ্ছাটাকে সে পাত্তা দিল না। ছেলেকে ভোলানোর জন্যে ছবি আঁকতে হবে। লেকের মাঝ থেকে উঠে আসছে দুষ্ট বুড়ো। জোছনার ছবি। মেরিন ব্লু, ডার্ক আম্বার, আইভরি ব্ল্যাক, হোয়াইট। চারটা রঙ। অনেকদিন ছবি আঁকা হয়

না। শওকতের মধ্যে টেনশন কাজ করতে শুরু করেছে। সাদা বোর্ডটা যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সে যেন গম্ভীর গলায় বলছে— আমার গায়ে রঙ ভরাতে যাচ্ছ। খুব সাবধান! খুব সাবধান।

ইমন প্রথম কথা বলল, কেমন আছ মা?

রেবেকা বললেন, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

ভালো।

শুধু ভালো, না বেশ ভালো?

বেশ ভালো।

আজ দুপুরে কী দিয়ে খেয়েছ?

খিচুড়ি।

শুধু খিচুড়ি?

হ্যাঁ। বাবা আর আমি আমরা দু'জনে মিলে রেঁধেছি।

তুমি কি রান্নাও শিখে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ। আমি চা বানাতেও পারি।

বলো কী?

চা বানানো যে এত সহজ আমি আগে জানতাম না।

আগে জানতে না— এমন অনেক কিছুই এখন জানবে। ভালো কথা, তোমার বাবার বাসায় কি কোনো কাজের মানুষ নেই?

না। সকালবেলা রহিমার মা বলে একজন মহিলা এসে ঘর ঝাঁট দেন। বাসন ধুয়ে দেন। তিনি এখন আসছেন না। তবে তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

রাতে কী খাবে?

রাতেও খিচুড়ি খাব। দুপুরে আমরা বেশি করে রান্না করেছি। অর্ধেক রেখে দিয়েছি রাতের জন্যে।

তুমি যদি চাও, আমি হোটেল সোনারগাঁ থেকে পিজা কিনে পাঠাতে পারি।

মা লাগবে না।

আমি যতদূর জানি পিজা তোমার খুবই পছন্দের খাবার।

খিচুড়িও আমার খুব পছন্দের খাবার মা।

তাহলে তো ভালোই। অ্যান্ডারসন তোমাকে একটা ফ্যাক্স পাঠিয়েছে। তোমাকে কি পড়ে শোনাব ?

হ্যাঁ।

'হ্যালো লিটল কাউবয়। হ্যাভিং ফান ?' এই দুই লাইন। তুমি যদি ফ্যাক্সের উত্তর দিতে চাও, আমাকে বলো, আমি উত্তর পাঠিয়ে দেব।

উত্তর দিতে চাই না।

কেন চাও না ? আমি যতদূর জানি তুমি অ্যান্ডারসনকে খুব পছন্দ কর।

আমি তাঁকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই, এই জন্যে উত্তর দিতে চাই না। এখন উত্তর দিলে সারপ্রাইজ হবে না।

কী সারপ্রাইজ ?

সেটা আমি তোমাকে বলব না। মা শোন, বাবা এখন আমার জন্যে একটা ছবি আঁকছে।

ভালো। হোক, ছবি আঁকাআঁকি হোক। শুভরাত্রি ইমন।

শুভরাত্রি।

শওকত অতি দ্রুত ব্রাশ ঘসছে। অনভ্যাসে কি বিদ্যা হ্রাস হয়েছে ? কব্জির ফ্লেক্সিবিলিটি কমেছে ? কব্জি সে-রকম ঘুরছে না। একজন পেইন্টারের জন্যে কালান্তক ব্যাধির নাম আর্থরাইটিস। আঙুল নড়বে না, কব্জি নড়বে না। সামান্য একটু নাড়ালেই তীব্র ব্যথায় ভুবন অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপরেও তাঁকে আঁকতে হবে। একজন সঙ্গীত-সাধকের কালান্তক ব্যাধি বধিরতা। তিনি সঙ্গীত সৃষ্টি করবেন কিন্তু কিছু শুনতে পাবেন না। মোজার্টের জীবনে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। তারপরেও তিনি মহান সঙ্গীত তৈরি করেছেন। শওকতের এই সমস্যা নেই। আর্থরাইটিসে তার আঙুল অচল হয় নি, তারপরেও সব কেমন আটকে আটকে যাচ্ছে।

ইমন গভীর মনোযোগে মোমের মুক্তা বানাচ্ছে। সবগুলি মুক্তা এক সাইজের হলে ভালো হতো। তা হচ্ছে না। একটার সঙ্গে একটা লেগে যাচ্ছে। নিয়ম হচ্ছে, মোমের প্রতিটি ফোঁটা আলাদা আলাদা ফেলতে হবে। তা সে পারছে না। এক সঙ্গে দু'টা-তিনটা ফোঁটা পড়ে যাচ্ছে। তার উচিত হাতে ধরে থাকা মোমবাতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। তা সে পারছে না। মাঝে-মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে সে তার বাবাকে দেখছে। বাবার চেহারা এখন একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। মুখের চামড়া কঠিন। ভুরু কুঁচকানো। চেহারায় কেমন যেন রাগী রাগী ভাব। ছবি আঁকার সময় কি মানুষের চেহারা রাগী রাগী হয়ে যায় ? ইমনের

তা মনে হয় না। তাদের আর্টের টিচারের চেহারা কখনো রাগী রাগী হয় না। বরং উল্টোটা হয়, চেহারা কোমল হয়ে যায়। তিনি আবার ছবি আঁকার সময় মাথা দুলিয়ে গানও করেন—

Can you hear the drums Farnando ?
I remember another story nights like this
In the fire lights Farnando !

এই গানটা তাদের আর্ট টিচারের খুব পছন্দ। কারণ তাঁর নিজের নামও Farnando.

শওকত ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, মুক্তা বানানো কেমন হচ্ছে ?

ইমন বলল, ভালো।

পিংক কালারের মোম কিনে আনব, তাহলে পিংক পার্ল বানাতে পারবে। তোমার কি ক্ষিধে লেগেছে ?

না।

ক্ষিধে লাগলে বলবে, আমরা ডিনার করে নেব।

আচ্ছা। বাবা শোন, তোমাকে আমি যদি একটি ছবি দেই, সেই ছবি দেখে তুমি কি মানুষটাকে আঁকতে পারবে ?

পারার তো কথা।

তাহলে তুমি একটা ছবি এঁকে দিও। ছবিতে মানুষটা সোফায় শুয়ে বই পড়ছে। কিন্তু চশমটা তার চোখে না। কপালে। উনি বই পড়ার সময় চশমাটা তাঁর কপালে তুলে দিয়ে বই পড়েন।

মানুষটা কে ?

মিস্টার অ্যান্ডারসন।

উনি কি তোমাকে খুব পছন্দ করেন ?

হ্যাঁ। আমাকে ডাকেন লিটল কাউবয়।

কাউবয় ডাকেন কেন ?

জানি না। বড়শি দিয়ে ট্রাউট মাছ ধরার ব্যাপারে তিনি অ্যাক্সপার্ট। একবার উনি একটা ট্রাউট মাছ ধরেছিলেন, সেটা আমার চেয়েও বড়।

বলো কী!

আমরা সেই ট্রাউট মাছটা দিয়ে কী করেছি শুনলে তুমি খুব মজা পাবে।

বলো শুনি।

আমরা করলাম কী, শুকনা কাঠ জোগাড় করে আগুন করলাম। তারপর মাছটাকে পোড়ালাম। খেতে গিয়ে দেখলাম, উনি লবণ আনতে ভুলে গেছেন। মাছ মুখে দিয়ে আমরা থুথু করে ফেলে দিলাম। উনি মাছটার উপর ভীষণ রেগে গেলেন।

মাছের উপর রেগে গেলেন কেন ? মাছটা তো কোনো ভুল করে নি। ভুল উনি করেছেন। লবণ আনেন নি।'

মিস্টার অ্যান্ডারসনের এরকমই স্বভাব। যে দোষী, তিনি তার উপর রাগ করেন না। অন্যের উপর রাগ করেন। মাছটার উপর তিনি ভয়ঙ্কর রেগে এফ ওয়ার্ড দিয়ে গালি দিলেন।

এফ ওয়ার্ডের গালিটা কী ?

তিনি বললেন, Fuck you fish. Fuck you হলো এফ ওয়ার্ডের গালি। খুব খারাপ গালি। তুমি কি এই গালি আগে শুনেছ ?

হ্যাঁ, শুনেছি।

এফ ওয়ার্ডের গালি ছাড়াও তিনি অন্য গালিও জানেন। যেমন SOB.

SOB আবার কেমন গালি ?

SOB হলো Son of a bitch. বাবা, তোমার কি চা খেতে ইচ্ছা করছে ? চা বানিয়ে আনব ?

আনো। চিনি আধা-চামচ বেশি দেবে। রাতের চায়ে আমি চিনি বেশি খাই।

ইমন চা বানাতে গেল। শওকত তাকিয়ে থাকল ছবিটার দিকে। ছবি ভালো হয় নি। বুড়ো মানুষটাকে আলখাল্লা পরানোর কারণে তাকে লাগছে রবীন্দ্রনাথের মতো। অবচেতন মনে কোথাও হয়তো রবীন্দ্রনাথ ছিল। সেই রবীন্দ্রনাথ উঠে এসেছেন। তাঁর অর্ধেক শরীর পানির নিচে। অর্ধেক উপরে। তিনি পিশাচের মতো চোখে বনভূমির দিকে তাকিয়ে আছেন। কী কুৎসিত!

ইমন চা নিয়ে এসে দেখে, তার বাবা কালো রঙ ঢেলে ছবি নষ্ট করছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম।

শওকত ছেলের দিকে তাকিয়ে আহত গলায় বলল, ছবিটা আঁকতে পারি নি। পরে এঁকে দেব। ঠিক আছে ?

ইমন বলল, ঠিক আছে।

আজ রাতেই এঁকে রাখব। ঘুম থেকে উঠে তুমি ছবি দেখতে পাবে।

ইমন বলল, ঠিক আছে। তুমি চা খাও। সিগারেট এনে দেব ?

দাও।

রাতে ইমনের ঘুম ভালো হলো না। যতবারই তার ঘুম ভাঙল, সে দেখল—তার বাবা ছবি আঁকছেন। তাঁর চোখ লাল। চোখে কেমন পাগল-পাগল দৃষ্টি। একবার তার ইচ্ছা করল বলে, বাবা, ছবি আঁকতে হবে না। এসো ঘুমিয়ে পড়ো। এই কথাটাও সে বলতে পারল না।

ইমনের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। ঘুম ভেঙে সে দেখল, তার বাবা তার পাশে বিছানায় বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর খুব বড় কোনো অসুখ হয়েছে। গা থেকে অসুখ-অসুখ গন্ধও আসছে। শওকত ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা সরি। ছবিটা আমি আঁকতে পারি নি। আমি ছবি আঁকা ভুলে গেছি।

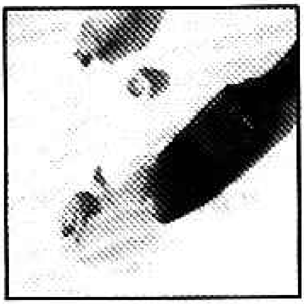

মতিয়ুর রহমানকে আজ অতি আনন্দিত মনে হচ্ছে। এমনিতেই তিনি আনন্দে থাকেন। তাঁর মুখভর্তি পান। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পান-সিগারেট কিছুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দু'টাই আজ ধরেছেন। ঘরে পান ছিল না। দোকান থেকে পাঁচ খিলি জরদা দেয়া পান এনেছেন। সেই পাঁচ খিলির তিনটা শেষ হয়ে গেছে। তাঁকে আবারো পান কিনতে যেতে হবে।

মতিয়ুর রহমানের আনন্দের কারণ তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছেলে ভালো। গ্রামে খামারবাড়ি করেছে। দু'টা পুকুর কাটিয়েছে। পুকুরে মাছের চাষ হয়। হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল নিয়ে থাকে বলেই বোধহয় চেহারায় চাষা চাষা ভাব আছে। সেটা কোনো বড় ব্যাপার না। পুরুষের পরিচয় চেহারায় না, কর্মে। ছেলে কর্মবীর।

বিয়ের এই প্রস্তাব এসেছে মিতুর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে। মিতুর শ্বশুর ওয়াজেদ আলী খোঁজখবর করে বের করেছেন। তাদের দিক থেকে সামান্য আত্মীয়তাও আছে। ওয়াজেদ আলী মানুষটাকেও মতিয়ুর রহমান খুব পছন্দ করেছেন। ওয়াজেদ আলীর যে পরিচয় পেয়েছেন, তাতে মনে হয়েছে— না এতদিনে মনের মতো একজনকে পাওয়া গেছে।

ওয়াজেদ আলী গলা নামিয়ে বলেছেন, বুঝেছেন বেয়াই সাহেব, আমাদের বয়স হয়ে গেছে। বেশিদিন নাই। যে-কোনো সময় আজরাইল এসে বলবে, এই শুওয়ের বাচ্চা, উঠ। সময় হয়েছে। বলবে না ?

বলবে তো বটেই।

শেষ কয়েকটা দিন যদি আমরা একটু রঙঢঙ করি, অসুবিধা আছে ?

অসুবিধা কী ?

ওয়াজেদ আলী আনন্দিত গলায় বললেন, সার কথা বলে ফেলেছেন। জগতের সার কথা হলো— অসুবিধা কী ? তোমরা ইয়াংম্যানরা যদি ফূর্তি করতে পার, আমরা কেন পারব না ? আমাদের দাবি আরো বেশি। আমাদের দিন শেষ। দিন শেষ কি-না বলেন ?

অবশ্যই দিন শেষ।

এখন যদি এই শেষ বেলায় মাঝে-মধ্যে সামান্য ওষুধ খাই, কার বাপের কী ? নিজের পয়সায় ওষুধ খাচ্ছি। তোর পয়সায় তো না।

মতিয়ুর রহমান বললেন, ওষুধ জিনিসটা বুঝলাম না।

ওয়াজেদ আলী বললেন, না বোঝার কী আছে! যে ওষুধ খেলে মনে আনন্দ হয়, রাতে ঘুম ভালো হয়, সেই ওষুধ। এখনো বুঝেন নাই ?

বুঝেছি।

কোকের সঙ্গে মিক্স করে নিয়ে এসেছি। খাবেন না-কি এক ঢোক ? গরমের সময় ভালো লাগে।

মতিয়ুর রহমানের খেতে খুবই ইচ্ছা করছে, তারপরেও বললেন, না থাক।

ওয়াজেদ আলী বললেন, আপনি না খেলে আমিও খাব না। এই জিনিস একা একা খেলে আর ওষুধ থাকে না, তখন হয়ে যায় বিষ।

মতিয়ুর রহমান তখন বেয়াইকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে ওষুধ মেশানো কোক বেশ খানিকটা খেয়ে ফেললেন।

ওষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, খামারবাড়ি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। বেশ কয়েকবার বললেন, এই ছেলে কর্মবীর, আসল কর্মবীর। আমার মেয়ের সঙ্গে যদি বিয়ের কথাবার্তা না হতো, তাহলে আমি এই ছেলের পা ছুঁয়ে সালাম করতাম। কদমবুসি করার মতো ছেলে।

ফেরার পথে তিনি খামারের চার কেজি দুধ, লাউ, লাউ শাক, পুকুরের সরপুটি, এক ঝুড়ি কাঁচা বাদাম নিয়ে ফিরলেন। ছেলে এই প্রথমবার চিনাবাদামের চাষ করেছে। ভালো ফলন হয়েছে।

মতিয়ুর রহমান ছেলের দু'টা ছবিও নিয়ে এসেছেন। আনিকাকে দেখাবেন।

পাত্রের ছবি হিসেবে দু'টা ছবির কোনোটাই চলে না। একটা ছবিতে ছেলে অস্ট্রেলিয়ান গরুর পিঠে হাত দিয়ে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটায় সে মালকোচা মেরে পুকুরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে চার কেজি ওজনের এক রুই মাছ।

রাতের খাবারের পর মতিয়ুর রহমান আনিকা এবং তার মা'কে ডেকে পাঠালেন।

তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে মূল প্রসঙ্গে যাবার শখ ছিল। আনিকা তা হতে দিল না। গম্ভীরমুখে বলল, যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। আমি শুয়ে পড়ব, আমার মাথা ধরেছে।

মতিয়ুর রহমান বললেন, তোর বিখ্যাত মাথা কি সবসময় ধরা অবস্থায় থাকে ?

আনিকা বলল, সবসময় থাকে না। এখন মাথা ধরেছে। কী বলবে বলো।

কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শান্ত হয়ে বস, তারপর বলি।

আনিকা বসল। মতিয়ুর রহমান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুই কী ঠিক করেছিস ? বিয়ে করবি নাকি করবি না ?

বিয়ে করব না এমন কথা তো কখনো বলি নি।

ছেলে কি তোর বোনের মতো তুই ঠিক করবি ? নাকি আমাদের হাতে ছেড়ে দিবি ?

আমার পছন্দের একজন আছে, তাকে বিয়ে করব।

সেই একজনটা কে ?

এখন কিছু বলতে চাচ্ছি না বাবা, যখন সব ঠিকঠাক হবে তখন বলব।

সব ঠিকঠাক হবে মানে কী ? কোন জিনিসটা বেঠিক ?

সবই বেঠিক। ঠিক করার চেষ্টা করছি।

মতিয়ুর রহমান বললেন, যে ছেলেকে বিয়ের কথা ভাবছিস, তাকে কি আমরা চিনি ?

হ্যাঁ চেন।

শওকত না তো ?

আনিকা কিছু বলল না। মতিয়ুর রহমান বললেন, এই বিষয় আমি আগেই সন্দেহ্ করেছি। আমি তো ফিডার দিয়ে দুধ খাই না। জগতের হিসাব জানি। আধাবুড়া এক ছেলে, তাকে বিয়ে করবি কোন দুঃখে ? টাকা নাই পয়সা নাই, আয়-রোজগার নাই। ভ্যাগাবন্ড।

আনিকা বলল, আমি কিছু কথা বলব। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। তুমি তো টিভির সিনেমার কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা মন দিয়ে শোন না।

মতিয়ুর রহমান বললেন, তুই কী বাণী দিবি যে মন দিয়ে মহামানবীর বাণী শুনতে হবে ?

আনিকা বলল, হ্যাঁ আমি বাণীই দেব। যে বুড়োর কথা তুমি বলছ, আমি যদি সেই বুড়োকে বিয়ে করি, তাহলে তোমাদের না খেয়ে থাকতে হবে না। অন্য কাউকে বিয়ে করলে আমাকে তার সংসারে উঠতে হবে। আমার চাকরির

একটা পয়সা তোমরা পাবে না। ওরা দিতে দিবে না। কোনো জামাই শ্বশুর-শাশুড়িকে তার বাড়িতে পুষবে না। আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করার আগে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা কর।

মতিয়ুর রহমান হতভম্ব হয়ে বললেন, মেয়ে হয়ে তুই আমাকে ভাতের খোঁটা দিলি ?

সারাজীবন তুমি আমাকে নানান বিষয়ে নানান খোঁটা দিয়েছ। আমি একটা দিলাম।

আজ থেকে যদি আমি তোর ভাতের দানা একটা মুখে দেই, তাহলে আমি মানুষের বাচ্চা না। আমি নেড়িকুত্তার বাচ্চা।

আনিকা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমি ঘুমুতে যাচ্ছি। ব্যথায় আমার মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে।

মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনোয়ারাও উঠে গেলেন।

মতিয়ুর রহমান পান মুখে দিলেন। সিগারেট ধরালেন। তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মেয়ের চাকরির টাকায় ভাত খেতে হবে— এই দুশ্চিন্তা না। তিনি খামারের ছেলেটাকে আগামীকাল সন্ধ্যায় বাসায় চা খেতে ডেকেছেন। উদ্দেশ্য চা খেতে খেতে আনিকার সঙ্গে দু'একটা কথা বলবে।

এই সমস্যার সমাধান কী ? সন্ধ্যায় চায়ের ব্যাপারটা বাদ দেয়া যায় কীভাবে ? বিয়ে না হলে না হবে। ভদ্রভাবে আনিকা ছেলেটার সঙ্গে টুকটাক কিছু কথা তো বলবে ?

মতিয়ুর রহমান টিভি ছাড়লেন। HBO-তে প্রায়ই ভূতের ছবি দেখায়। মতিয়ুর রহমান ইংরেজি মোটেই বুঝেন না। ভূতের ছবির সুবিধা হলো, ইংরেজি না বুঝলেও ছবি বুঝতে কষ্ট হয় না। রাতদুপুরে ভূত-প্রেতের ছবি দেখতে তাঁর ভালোই লাগে। জীবনের শেষপ্রান্তে যে চলে এসেছে, তার কাছে ভালো লাগাটা জরুরি।

আনিকা বাতি নিভিয়ে শুয়ে আছে। মনোয়ারা মেয়ের মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছেন। মাথায় সিঁথি করে আঙুলের ডগায় তেল নিয়ে সেই তেল ঘসা। মনোয়ারা এই কাজটা খুব ভালো পারেন। নারিকেল তেল তিনি আগে গরম করে নেন। পাশে ঠাণ্ডা পানির একটা বাটি থাকে। গরম তেল মাথায় ঘষার পরপর তিনি তাঁর আঙুল ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে ম্যাসেজ শুরু করেন। এই অংশটা খুব আরামদায়ক।

মনোয়ারা দ্রুত আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, ভাতের খোঁটা দেয়া ভালো না রে মা।

আনিকা জড়ানো গলায় বলল, আমার মেজাজ ঠিক ছিল না।

মনোয়ারা বললেন, তোর বাবা মুখে কিছু না বললেও মেয়ের উপর ভর করে বেঁচে আছে— এটা ভেবে সবসময় ছোট হয়ে থাকেন। কেউ কিছু না বুঝলেও আমি বুঝি। ছেলেমেয়ের কাছে ছোট হয়ে থাকা বড় কষ্টের।

আনিকা কিছু বলল না। তার ঘুম পাচ্ছে। কথা বললেই ঘুম কেটে যাবে। আরামের ঘুম কাটাতে ইচ্ছা করছে না।

মনোয়ারা বললেন, আনিকা ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

আনিকা বলল, না।

তাহলে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আমার মেজোভাই— তোর মিজু মামা, একসময় সস্তা জমি পাওয়া যাচ্ছে দেখে বান্দরবানে অনেক জমি কিনেছিল। ঘর-দুয়ার বানিয়েছিল। পাহাড়িদের সঙ্গে সমস্যা শুরু হলে সে চিটাগাং চলে আসে। তার জমিজমা এখনো সেখানে আছে। বিক্রির চেষ্টা করছিল, বিক্রি করতে পারে নি।

আনিকা বলল, আসল কথা কী বলতে চাচ্ছ, সেটা বলো। এতক্ষণ ধরে তবলার টুকটাক শুনতে পারব না।

আসল কথা হলো, আমি মেজোভাইকে চিঠি লিখেছিলাম। উনার জায়গাজমি আমি আর তোর বাবা দেখাশোনা করব, সেখানে গিয়ে থাকব। ভাইজান চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছেন। আমাদের যেতে বলেছেন।

এই বিষয় কি বাবা জানে ? বাবাকে কিছু বলেছ ?

না। তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেলেই তোর বাবাকে বলব। সে খুশি হয়েই রাজি হবে।

কানের কাছে আর ঘ্যানঘ্যান করবে না, আমার ঘুম পাচ্ছে।

মনোয়ারা ক্ষীণ স্বরে বললেন, তোর যাকে খুশি তাকে বিয়ে কর। বিয়ে করে সুখী হ। আমাদের কথা ভাববি না। আমরা আমাদের ব্যবস্থা করব।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মা, আরেকটা কথা বলি ?

আনিকা বিরক্ত গলায় বলল, সব কথা কি তোমার আজই বলতে হবে ?

থাক আরেকদিন বলব। না বললেও চলে, এমন কোনো জরুরি কথা না। জরুরি কথাটা আগে বলে ফেলেছি।

আনিকা বলল, কী বলতে চাচ্ছ বলো। যে ভণিতা দিয়ে কথা শুরু করেছ, এখন বাকিটা না শুনলে রাতে ঘুম হবে না।

মনোয়ারা বললেন, কথাটা মনজু সম্পর্কে।

ভাইয়াকে নিয়ে কথা ? তার নাম উচ্চারণ করাই তো নিষিদ্ধ। বলো কী কথা তার বিষয়ে।

তার মৃত্যুর জন্যে তুই মনে মনে আমাকেও দায়ী করিস। তোর ধারণা আমার এবং তোর বাবার— এই দুইজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে।

মা, কথাটা কি ভুল ?

আমার বিষয়ে কথাটা ভুল। আমার অপরাধ একটাই— তোর বাবা যখন তার উপর রাগ করত, গালাগালি করত, আমি চুপ করে থাকতাম। কিছু বলতাম না। মা শোন, চুপ করে থাকা আমার স্বভাব। তোর বাবা যখন রেগে গিয়ে হৈচৈ করে, তখন আমি চুপ করে থাকি। তোর উপর যখন রেগে যায়, তখনো কিন্তু চুপ করেই থাকি। যখন বুঝি তুই মনে কষ্ট পেয়েছিস, তখন মাথায় তেল মাখিয়ে দেই। তোর মাথায় যেমন আমি বিলি কেটে দেই, মনজুর মাথায়ও দিতাম।

আনিকা বিছানা থেকে উঠে বসল। মা'র দিকে তাকাল।

মনোয়ারা বললেন, মনজু ঘুমের ওষুধ খাবার আগে দু'টা চিঠি লিখেছিল। একটা তোর বাবাকে, একটা আমাকে। আমার চিঠিটা তুই একদিন পড়ে দেখিস। চিঠিটা কাউকে পড়াতে আমার লজ্জা লাগে বলেই লুকিয়ে রাখি।

চিঠি তুমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছ, তাই না মা ?

হ্যাঁ।

চিঠিটা রাখ। রেখে চলে যাও।

আমার সামনেই পড়।

না।

মনোয়ারা তেলের বাটি নিয়ে উঠে গেলেন।

দামি রেডিও বন্ড কাগজে গুটি গুটি করে লেখা চিঠি। মুক্তার মতো হাতের লেখা। যেন সাদা কাগজে অক্ষর সাজিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে।

মাগো,

আমি খুব বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছি। মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। একটা কষ্ট নিয়ে আমি পৃথিবী থেকে যাচ্ছি। কষ্টটা হচ্ছে, তোমার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারলাম না।

প্রায়ই খুব কষ্ট পেয়ে আমি রাতে শুয়ে শুয়ে কাঁদতাম। আমার ঘুম আসত না। তুমি গভীর রাতে তেলের বাটি নিয়ে আসতে। একটা কথাও বলতে না। আমার মাথা তোমার কোলে তুলে নিয়ে চুলে বিলি কাটতে। কেন কিছু কিছু মানুষ তোমার মতো ভালো হয়? মা শোন, আমরা সবচে' কষ্ট পাই কিন্তু ভালো মানুষদের জন্যে। তুমি এত ভালো কেন হলে?

তোমার ছেলে

মনজু

আজ ইমনের জন্মদিন। জন্মদিনের ছোট্ট মানুষটা খালি গায়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ঘুমাবার সময় তার গায়ে লাল রঙের একটা টি-সার্ট ছিল। কখন খুলেছে কে জানে! নিশ্চয়ই গরম লাগছিল। গরম লাগার কথা। সিলিং ফ্যানে কোনো একটা সমস্যা আছে। প্রচণ্ড শব্দে ঘোরে, সেই তুলনায় বাতাস হয় না। শওকত ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব মায়া লাগছে। বেচারা যে আগ্রহ নিয়ে বাবার কাছে এসেছিল, সেই আগ্রহের ফল কি সে পেয়েছে ? মনে হয় না। ছেলেকে আনন্দে অভিভূত করার মতো কিছু করতে পারে নি। গল্প করেছে— এই পর্যন্তই। গল্প করে কাউকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা তার নেই।

ছেলেটাকে নিয়ে ঢাকার বাইরে কোথাও যেতে পারলে হতো। যাওয়া হয় নি। কেন জানি ইচ্ছা করে নি। মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে, তার ইচ্ছাগুলিও ছোট হতে থাকে। তার এখন দিন-রাত ঘরে বসে থাকতেই ভালো লাগে। সমস্ত ইচ্ছা ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি হয়ে গেছে।

শওকত বিছানা থেকে নামল। সে এখন মগভর্তি করে এক মগ চা বানাবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরাবে। প্রথম সিগারেট শেষ হবার পর দ্বিতীয় সিগারেট। মানুষ খুব সহজে রুটিনে আটকা পড়ে যায়। সে রুটিনে আটকা পড়ে গেছে। সকালে মগভর্তি চা তার রুটিনের অংশ।

আকাশে মেঘ করেছে। ঝুম বৃষ্টি হবে— এরকম মেঘ না। এই ক'দিনে একবারও ঝুম বৃষ্টি হয় নি যে ছেলেকে নিয়ে সে বৃষ্টিতে ভিজবে। আনন্দময় কোনো স্মৃতি কি এই ছেলে নিয়ে যেতে পারবে ?

আজ ইমনের জন্মদিন। আজ সে থাকবে। আগামীকালও থাকবে। পরশু তাকে তার মায়ের কাছে দিয়ে আসতে হবে। যেখান থেকে সে এসেছিল, সেখানে ফিরে যাবে। মিস্টার অ্যান্ডারসন নামের একজন মানুষের হাত ধরে সে লেকে মাছ ধরতে যাবে। বাড়ির পেছনের পোর্চে মিস্টার অ্যান্ডারসন বারবিকিউ করবেন। ইমন তাকে সাহায্য করবে। এখন যেমন সে তার বাবাকে সাহায্য করে সেরকম। চা বানানোর একটা বিদ্যা সে তার বাবার কাছ থেকে শিখেছে।

এই বিদ্যা নিশ্চয় সে মিস্টার অ্যান্ডারসনকে দেখাবে।

শওকত চায়ের মগ নিয়ে মেঝেতে বসল। এই বাসা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এখানে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স হবে। মাপামাপি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হবে এই মাসের শেষ থেকে। শওকতকে নতুন কোনো আস্তানা খুঁজে বের করতে হবে। গ্রামের বাড়ি-ঘর ঠিক করে কিছুদিন গ্রামে গিয়ে থাকলে হয়। ইমনকে গ্রামের বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে এলে হতো। ঝোপ, বাঁশবন, ডোবা। বাড়ির পেছনে বিলের মতো আছে। সকালের দিকে সেই বিলে অনেক বক দেখা যায়। এইসব দৃশ্য দেখলে সে মজা পেত। তাকে কোনো কিছুই দেখানো হয় নি। মিস্টার অ্যান্ডারসনের একটা ছবি আঁকা হয় নি। আঁকা হবে এরকম মনে হচ্ছে না। ছবি বানানোর বিদ্যা তাকে ছেড়ে গেছে। মাথার কোনো এক রহস্যময় জায়গায় জট লেগে গেছে। হয়তো কোনো একদিন সেই জট খুলবে। সে আবারো ছবি আঁকতে শুরু করবে। তখন মিস্টার অ্যান্ডারসনের ছবিটা এঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে একটা চিঠি। চিঠিটা সে বাংলায় লিখবে, তারপর ভালো ইংরেজি জানে এমন কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নেবে।

সে দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরিয়ে চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

> প্রিয় মিস্টার অ্যান্ডারসন,
>
> জলরঙে আঁকা আপনার একটি ছবি পাঠালাম। ছবিতে আপনি এবং ইমন মাছ ধরছেন। আমার ছেলেটিকে আপনি যে মমতা এবং স্নেহ দেখিয়েছেন, সে তা মনে রেখেছে এবং আমার কাছে প্রতিটি গল্প অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেছে। আপনি আমার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ দেখিয়েছেন তা যেন বহুগুণে আপনার কাছে ফিরে আসে, আমি সেই প্রার্থনা করছি। ইমনের কাছে শুনে শুনে আমি আপনার একটি রূপক ছবি আমার মনে তৈরি করেছি। ছবিটি বটবৃক্ষের। যেন আপনি ছায়াদায়িনী বিশাল বটবৃক্ষ। আমার ছোট্ট ইমন তার ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।
>
> আমার দুর্ভাগ্য আমি আমার পুত্রকে কোনো ছায়া দিতে পারি নি। আমি একজন পরাজিত পেইন্টার। পরাজিত মানুষ ছায়া দিতে পারে না, কারণ তারা নিজেরাই ছায়া খুঁজে বেড়ায়।
>
> আপনি আমার এই চিঠি পড়ে ভাববেন না যে আমি ছেলেকে কাছে না পেয়ে খুব মনঃকষ্টে থাকি। মানুষ অতি

দ্রুত সমস্ত পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ইমন কেমন আছে, কী করছে— এইসব সেন্টিমেন্টাল বিষয় নিয়ে ভাবি না। শুধু তার জন্মদিনে ৯ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চি ইজেলে মনের সুখে লেমন ইয়েলো রঙ মাখাই। তার জন্মের পর-পর আমি তার নাম রেখেছিলাম লেমন ইয়েলো।

শওকত হঠাৎ হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে লম্বা চিঠি ফেঁদে বসেছে। কোনো মানে হয়? কাকে দিয়ে অনুবাদ করাবে? তারচে' নিজেই একটা কাগজে লিখবে— With complements. from Imon's dad. কিংবা শুধু লেখা থাকবে— With complements নিচে সে তার নাম সই করবে।

ইমন জেগে উঠেছে। বাবার সন্ধানে সে চলে এসেছে বারান্দায়। শওকত বলল, Hello!

ইমন বলল, Hello! Good morning.

আজ তোমার জন্মদিন। Happy birthday baby.

থ্যাংক য়্যু।

জন্মদিনে কী করতে চাও?

জানি না।

আমেরিকায় কীভাবে জন্মদিন করতে?

স্কুলের সব বন্ধুরা আসত। কেক কাটা হতো। গিফট খোলা হতো।

এর বাইরে বিশেষ কিছু হতো না? আমার ধারণা মিস্টার অ্যান্ডারসন তোমার জন্মদিনে মজার কিছু করেন। ধারণা ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক। উনি ক্লাউনের পোশাক পরে ম্যাজিক শো করেন।

উনি ম্যাজিক জানেন না-কি?

খুব ভালো ম্যাজিক জানেন।

আর তোমার মা? সে বিশেষ কিছু করে না?

না।

কিছুই করে না?

মা শুধু কেক কাটার সময় তোমার হয়ে আমার কপালে চুমু দেয়।

আমার হয়ে চুমু— ব্যাপারটা ব্যাখ্যা কর।

মা বলে, লেমন ইয়েলো। হ্যাপি বার্থডে। তুমি তো আমাকে লেমন ইয়েলো নাম দিয়েছিলে, আমার জন্মদিনে মা একবার এই নামে আমাকে ডাকে।

শওকত শান্ত গলায় বলল, এতটা সম্মান তোমার মা আমাকে দেয়— এটা আমি চিন্তাও করি নি। যাও হাত-মুখ ধুয়ে আস। জন্মদিনে আমরা কী করব ঠিক করে ফেলি। তোমার মাকে দাওয়াত করে নিয়ে আসি।

মা আসবে না।

অবশ্যই আসবে।

আসবে না। মা আগেই বলে দিয়েছে এই জন্মদিনটা আমি যেন শুধু তোমার জন্যে করি।

শুধু তুমি আর আমি জন্মদিন করব?

তুমি তোমার বন্ধুদের বলো। তোমার বন্ধু নেই?

শওকত বলল, না। এক সময় অনেক বন্ধু ছিল, এখন আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

কারো সঙ্গেই যোগাযোগ নেই?

অনেকের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়। তাদের বাসার ঠিকানা জানি না। শুধু একজনের ঠিকানা জানি— তৌফিক। ধানমণ্ডিতে থাকে। বড় পেইন্টার হিসেবে নাম করেছে।

উনাকে আসতে বলো। তুমি কি আমার জন্যে কোনো গিফট কিনেছ বাবা?

না।

গিফট কিনতে হবে। মিস্টার অ্যান্ডারসন তুমি আমাকে কী গিফট দেবে সেটা আমাকে গোপনে বলেছেন। আমি দেখতে চাই তার কথা ঠিক হয় কি-না।

ইমন মিটিমিটি হাসছে। বাবাকে বড় ধরনের চিন্তার মধ্যে ফেলে দিতে পারায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

আজকের নাশতা বাইরে থেকে এসেছে। কিং বিরানি হাউসের তেহারি। বাংলাদেশের এই খাবারটা ইমনের পছন্দ হয়েছে। ইমনের ধারণা এই খাবারটা ম্যাকডোনাল্ডের বার্গারের কাছাকাছি। সে অবশ্যি তেহারি বলতে পারে না। বলে তোহারি।

নাশতার মাঝখানে আনিকা এসে উপস্থিত। সে ঢুকল বিব্রত ভঙ্গিতে। ইমন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম বাবার বাসায় সে বাইরের কাউকে আসতে দেখল।

আনিকা ইমনের দিকে তাকিয়ে বলল, ইমন, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। শুভ জন্মদিন।

ইমন বলল, থ্যাংক য়্যু।

আমি তোমার জন্যে জন্মদিনের গিফট এনেছি। জানি না তোমার পছন্দ হবে কি-না।

কী গিফট এনেছ ?

কচ্ছপের বাচ্চা।

কিসের বাচ্চা ?

কচ্ছপের বাচ্চা। কচ্ছপ চেন না! Turtle.

তোমাদের এখানে Pet shop আছে ?

আছে।

আনিকা হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে পানি ভর্তি হরলিক্সের বোতল বের করল। বোতলের ভেতর ছোট ছোট দু'টা কচ্ছপের বাচ্চা উঠা-নামা করছে। ইমন মুগ্ধ গলায় বলল, Oh my God. What a surprise! ইমন হাতের চামচ ছুড়ে ফেলে ছুটে এসে হরলিক্সের বোতল হাতে নিল।

আনিকা বলল, উপহার পছন্দ হয়েছে ?

ইমন বলল, খুব পছন্দ হয়েছে। I am so happy.

আমাকে ধন্যবাদ দিলে না তো ?

আমি এত খুশি হয়েছি যে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেছি। মিস, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমাকে মিস কেন বলছ ? আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার এখনো বিয়ে হয় নি ?

হ্যাঁ।

আনিকা শওকতের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো তোমার ছেলের জন্মদিনে আমাকে আসতে বলবে না, আমি নিজ থেকে চলে এসেছি। ভয় নেই, বেশিক্ষণ থাকব না। আমার অফিস আছে, আমি অফিসে চলে যাব।

শওকত বলল, চা খেয়ে যাও।

চা এক কাপ খেতে পারি।

আনিকা ইমনের চেয়ারটায় বসল। বাসায় দু'টাই চেয়ার। ইমন তার চেয়ার খালি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুগ্ধ দৃষ্টি সে একবারও কচ্ছপ দু'টা থেকে সরাচ্ছে না।

আনিকা বলল, আমি তোমার এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম, খুব সুন্দর একটা ছেলে দেখব। কিন্তু এত সুন্দর কাউকে দেখব ভাবি নি। তোমার ছেলের চেহারায় কোথায় যেন দেবদূত দেবদূত ভাব আছে। ঠিক না ?

শওকত জবাব না দিয়ে চা বানাতে গেল। ইমন আনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কি এদের হাত দিয়ে ধরতে পারি ? এরা কি কামড়ায় ?

আনিকা বলল, এখন কামড়াবে না। তুমি ইচ্ছা করলে এদের হাতে নিতে পার। তবে এরা বড় হলে কিন্তু কামড়ায়। খুব শক্ত কামড়। এরা যখন কাউকে কামড়ে ধরে, তখন আর ছাড়ে না।

কামড়ে ধরেই থাকে ?

হ্যাঁ।

তখন কী করলে এরা কামড় ছেড়ে দেয় ?

কিছুতেই ছাড়ে না। মাঝে-মাঝে এমনও হয়েছে— গলা কেটে ফেলতে হয়েছে। তারপর ছেড়েছে।

খুব আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নেই। মানুষের মধ্যেও এরকম কচ্ছপ স্বভাব আছে। কিছু মানুষ আছে যারা কচ্ছপের মতো। কাউকে কামড়ে ধরলে ছাড়ে না। যেমন আমি। আমি যদি কাউকে ধরি, তাহলে ছাড়ি না। মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখি।

ইমন বলল, তুমি কাকে ধরেছ ?

আনিকা বলল, আপাতত তোমাকে ধরেছি।

ইমন একটা কচ্ছপ হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। তার মাথায় কোনো পরিকল্পনা আছে।

শওকত চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আনিকা, তুমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধানে বলবে। সে খুব স্মার্ট ছেলে। তুমি যা বলবে তা তো সে বুঝবেই, যা বলবে না তাও বুঝবে।

আনিকা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমি যদি কিছুক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকি, তোমাদের অসুবিধা হবে ?

শওকত বলল, অসুবিধা হবে কেন ?

প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়ে দিও না। অসুবিধা হবে কি হবে না সেটা বলো।

অসুবিধা হবে না। বরং আমার খুবই লাভ হবে। আমি দুই-তিন ঘণ্টার জন্যে বাইরে যাব। ছেলেকে তোমার কাছে রেখে যেতে পারি। তিন ঘণ্টা থাকতে পারবে ?

পারব।

তোমাকে অফিসে যেতে হবে না?

তোমাদের সঙ্গে আজ বেশকিছু সময় থাকব। দুপুরে তোমাদের রান্না করে খাওয়াব— এই ভেবে আমি আজ ছুটি নিয়েছি। তুমি থাকতে দেবে কি দেবে না— এই ভেবে শুরুতে অফিস থেকে ছুটি নেবার কথা বলি নি।

দুপুরে কী খাওয়াবে?

তোমার ছেলে যা খেতে চায়, তাই খাওয়াব।

তুমি রান্না করতে জানো তা জানতাম না।

আমি অনেক কিছুই জানি, যা তুমি জানো না।

রান্না যে করবে— জিনিসপত্র লাগবে না?

সেই ব্যবস্থা আমি করব। নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনব। তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সে কি যাবে আমার সঙ্গে?

যাবে। কচ্ছপ দিয়ে তুমি তারে কব্জা করে ফেলেছ।

আনিকা বলল, আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি যাদেরকে কব্জা করতে চাই তাদের কব্জা করতে পারি না। আর যাদের কব্জা করার আমার কোনো প্রয়োজন নাই, তারা কীভাবে কীভাবে যেন কব্জায় চলে আসে।

খারাপ কী? কেউ না কেউ তো কব্জায় আসছে।

খারাপ বলছি না তো! ইয়েলো ক্যাবের ড্রাইভারের কথা তোমার মনে আছে?

কোন ড্রাইভার?

আকবর নাম। যার গাড়িতে করে তোমাকে তুলে মগবাজার কাজি অফিসে গিয়েছিলাম। সে এখন কব্জায় চলে এসেছে। আমি যাতে গান শুনতে পারি, সেজন্যে সে তার গাড়ির ক্যাসেটপ্লেয়ার ঠিক করেছে। মাঝে-মধ্যেই সে বাসায় চলে আসে, আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

বিনা পয়সায় ট্যাক্সি চড়ায়, না-কি টাকা নেয়?

টাকা নেয়। ট্যাক্সিড্রাইভার ছাড়া আরো একজনকে কব্জা করেছি।

সে কে?

নাম জামাল। খামারের মালিক। গরু-ছাগল পুষে। পুকুরে মাছ চাষ করে। কাল সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় চা খেতে এসেছিল। তার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছি, আমাকে তার অসম্ভব মনে ধরেছে। আমি খুবই অবাক হয়েছি।

অবাক হবার কী আছে ? তুমি কি মনে ধরার মতো মেয়ে না ?

এক সময় হয়তো ছিলাম, এখন নাই। আমার চেহারা কথাবার্তা সব কেমন জানি শুকনা হয়ে গেছে। দশটা-পাঁচটা চাকরি করি বলে হয়তো এরকম হয়েছে।

শওকত জবাব দিল না। আনিকা কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে আছে। তার মুখ দেখে মায়া লাগছে।

আনিকা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোমার ছেলে কবে যাবে ?

পরশু।

মন খারাপ ?

শওকত জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আনিকাকে দেখে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে। ঘণ্টা দুই-তিন সময় তার আসলেই দরকার। পত্রিকা অফিসে যেতে হবে। ইলাসট্রেশনের কাজ করে দিয়ে আসতে হবে। দেরি হয়ে গেছে। মাসুম সাহেব এই দেরি সহজভাবে নেবেন বলে মনে হয় না। মেজাজ গরম মানুষ। হুট করে বলে বসতে পারেন— আপনাকে আমাদের দরকার নেই। আপনি আপনার পথ দেখুন। আমরা আমাদের পথ দেখব। ইলাসট্রেশন হিসেবে কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং চালাচ্ছেন। কাক-বক দিয়ে আর চলবে না। মাসুম সাহেবের সঙ্গে দেখা করারও আগে ইমনের মা'র সঙ্গে দেখা করা দরকার। ছেলের জন্মদিনে উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ। ইমন বলছে তার মা আসবে না। কিন্তু শওকতের ধারণা সে আসবে। অনেকদিন ছেলেকে দেখে নি। বিশেষ একটি দিনে ছেলের সঙ্গে থাকার সুযোগ সে নষ্ট করবে না। রেবেকা কঠিন মেয়ে, কিন্তু এত কঠিন না।

ইমন খুবই ব্যস্ত দুই কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজনে। আনিকা এই বিষয়ে তাকে সাহায্য করছে। মেঝেতে চক দিয়ে দু'টা লাইন টানা হয়েছে। কচ্ছপ দু'টিকে একসঙ্গে ছাড়া হচ্ছে। দু'জনের একজন সোজাসুজি যাচ্ছে, অন্যজন শুরুতেই নব্বুই ডিগ্রি টার্ন করছে। ইমন এবং আনিকা দু'জন হাল ছাড়ার পাত্র না। তারা চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে। আনিকা শুকনা মরিচের গুঁড়া এনে কচ্ছপের দৌড়ের জায়গা ছাড়া অন্য সব দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে তেমন কোনো লাভ হয় নি। শুকনা মরিচ ছড়ানো জায়গায় কচ্ছপ যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তারা দু'জনই দৌড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে।

আনিকা বলল, দাঁড়াও, আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে। এই বুদ্ধিতে মনে হয় কাজ হবে।

ইমন আগ্রহের সঙ্গে বলল, কী বুদ্ধি ?

বুদ্ধিটা এখনো ঠিকমতো জমে নি। মানে হলো— মাথায় পুরোপুরি আসে নি। আসি আসি করছে।

বুদ্ধি আনার ব্যাপারে আমি কি তোমাকে হেল্প করতে পারি ?

না।

আমি চা বানানো শিখেছি। তুমি কি চা খাবে ?

চা বানানো কার কাছে শিখেছ ?

আমার বাবার কাছে।

আর কিছু শিখেছ ?

খিচুড়ি বানানো শিখেছি, তবে সেটা কঠিন।

দেখি চা বানাও তো। সাবধান, আবার হাত পুড়িও না।

ইমন আগ্রহের সঙ্গে চা বানাতে গেল। দুই কচ্ছপের দৌড় দেয়ানোর জন্যে মেয়েটার চেষ্টা দেখে সে মুগ্ধ। ছোটদের কোনো কাজে বড়রা কখনোই এত আগ্রহ দেখাবে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে আনিকা বলল, তুমি তো আসলেই চা ভালো বানিয়েছ। ছোটদের বানানো চায়ে একটা সমস্যা সবসময় থাকে— চা-টা হয় ঠাণ্ডা! তোমারটা হয় নি।

চা কীভাবে গরম বানাতে হয় বাবা শিখিয়েছে।

আনিকা বলল, মায়েরা তার ছেলেমেয়েদের অনেক কিছু শেখায়। মায়ের শেখানো কোনো কিছুই ছেলেমেয়েরা মনে রাখে না। বাবারা যা শেখায় তাই মনে রাখে।

ইমন বলল, তোমার বাবা তোমাকে কী শিখিয়েছিলেন ?

পানিতে চাক্তি মারা।

সেটা কী ?

একটা চাক্তি নিয়ে পুকুরের পানিতে ছুড়ে মারা। চাক্তিটা এমনভাবে ছুড়তে হয় যেন সেটা পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। দেখলে মনে হবে একটা ব্যাং পানির উপর লাফ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

তোমার বাবা এটা তোমাকে শিখিয়েছেন ?

হ্যাঁ। আমরা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পুকুরপাড়ে বসে আছি। বাবা এসে উপস্থিত। বাবাকে দেখে খুব ভয় পেলাম। দৌড়ে পালিয়ে যাব ভাবছি, তখন...

বাবাকে ভয় পেলে কেন ?

আমার বাবা অন্য বাবাদের মতো না। উনি কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করেন।

কিন্তু তিনি তোমাকে চাক্তি মারা শিখিয়েছেন।

হ্যাঁ, তা শিখিয়েছেন।

তুমি কি আমাকে শেখাতে পারবে ?

হ্যাঁ পারব।

কখন শেখাবে ?

এখনই শেখাতে পারি। আমার দরকার কয়েকটা চাক্তি আর একটা পুকুর।

চাক্তি এবং পুকুর কোথায় পাওয়া যায় ?

ঢাকা শহরেই পাওয়া যায়। চল রমনা লেকে যাই।

কচ্ছপ দু'টাকে কি রেখে যাব, না সঙ্গে নিয়ে যাব ?

আমার মনে হয় সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো হবে।

আনিকার পুকুরের পানিতে চাক্তিমারা দেখে ইমন হতভম্ব হয়ে গেল। আসলেই মনে হচ্ছে পানি স্পর্শ করে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা ব্যাং যাচ্ছে।

ইমন বলল, তোমার এবং তোমার বাবা— তোমাদের দু'জনের অনেক বুদ্ধি।

এটা ঠিক না। আমরা দু'জনই বোকা। বেশ বোকা। আমি একটু কম। আমার বাবা একটু বেশি।

পানিতে চাক্তি মারা ছাড়া তুমি আর কী জানো ?

আর কিছু জানি না। তবে গান গাইতে পারি।

বাংলা গান ?

হ্যাঁ, বাংলা গান। শুনবে ?

শুনব।

আনিকা সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু করল— 'মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম'। স্কুলের অনুষ্ঠানের পর আনিকা আর গান গায় নি। বহু বছর পর আবার গাইছে। সে নিজেই অবাক হয়ে লক্ষ করল, খুব ভালো গাইছে তো! গলায় সুর আছে। ভালো মতোই আছে। গান গাইতে গাইতে আনিকার চোখ ভিজে গেল।

ইমন বলল, তুমি কাঁদছ কেন ?

আনিকা বলল, গান গাইতে গাইতে আমি কল্পনায় দেখছিলাম আমি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটা পার্কে বসে গান করছি— সবাই খুব মজা করে আমার গান শুনছে।

ইমন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। এই অদ্ভুত মহিলার কথাগুলি সে বোঝার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারছে না।

আনিকা বলল, ইমন, আমার গান কি তোমার পছন্দ হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে। আরেকবার গাও।

আনিকা সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করল। পার্কে লোকজন তেমন নেই। সকাল দশটা-এগারোটার দিকে রমনা লেকে কেউ বেড়াতে আসে না। তারপরও কিছু লোকজন আছে। তাদের কেউ কেউ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। কয়েকজন আবার গান শোনার জন্যে এগিয়ে আসছে। আনিকা চোখ বন্ধ করে গাইছে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। ইমন খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। এই মহিলা এমন করে কাঁদছে কেন— সে বুঝতে পারছে না। তারচেয়েও বড় কথা তার নিজের খুব কান্না পাচ্ছে।

রেবেকা এবং শওকত মুখোমুখি বসে আছে। শওকত ভয়ে ভয়ে ছিল। রেবেকা প্রথমেই কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করবে— ছেলেকে কার কাছে রেখে এসেছ ? সে তা করে নি। শওকত ছেলের জন্মদিনে তাকে নিতে এসেছে শুনে সে সহজভাবে বলল, আমরা দু'জন একসঙ্গে উপস্থিত থাকলে ইমন বিব্রতবোধ করবে। সে মা'কে খুশি রাখবে না বাবাকে খুশি রাখবে— এটা নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে আমি অনেক জন্মদিন একা একা করেছি। আজকেরটা তুমি কর। তুমি কি তার জন্যে কোনো গিফট কিনেছ ?

শওকত বলল, না। কী কিনব বুঝতে পারছি না। সে কী পছন্দ করে ?

বাচ্চা মানুষ তো, যা দেবে তাই পছন্দ করবে। তবে তুমি তাকে একটা সাইকেল কিনে দিতে পার। তার সাইকেলের খুব শখ। একা একা চালাতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করবে ভেবে আমি কিনে দেই নি।

সাইকেল ?

হ্যাঁ। তার সাইকেলের খুব শখ।

সাইকেল তো সে সঙ্গে করে আমেরিকা নিয়ে যেতে পারবে না।

তা পারবে না। সাইকেল থাকবে তোমার কাছে। সেটা খারাপ কী ? স্মৃতি থাকল। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। সাইকেল কেনার মতো টাকা কি তোমার কাছে আছে ?

আছে।

তাহলে তাকে একটা সাইকেল কিনে দাও। অ্যান্ডারসন তোমার ছেলেকে গোপনে বলেছে যে, তুমি তাকে একটা সাইকেল দেবে। অ্যান্ডারসনের কথা সত্যি হয় কি-না তা দেখার জন্যে ইমন মনে মনে অপেক্ষা করছে।

আমি অবশ্যই সাইকেল কিনে দেব।

তুমি তোমার নিজের জীবনটা গোছাবার চেষ্টা কর। ভেজিটেবল হয়ে বেঁচে থাকার মানে হয় না।

শওকত হাসল। রেবেকা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার পাশ কাটানো হাসিটা হাসবে না। তোমার অনেক জিনিসের মতো তোমার নন কমিট্যাল হাসিও আমার পছন্দ না। সাইকেল কেনার টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পার।

টাকা আছে।

শওকত উঠে দাঁড়াল। রেবেকাও সেই সঙ্গে উঠল। শওকত বলল, যাই ? রেবেকা বলল, যাও। তোমাকে যে প্রতি রাতে বোবায় ধরত, সেই অসুখটা কি এখনো আছে ?

আছে।

এই অসুখের ভালো চিকিৎসা বের হয়েছে। এটা একটা সাইকো সমেটিক ব্যাধি। টাইম পত্রিকার গত অক্টোবর সংখ্যায় এই রোগটার উপর বড় একটা আর্টিকেল বের হয়েছে। আমি টাইম পত্রিকাটা নিয়ে এসেছি। দেব তোমাকে ?

দরকার নেই।

অনেক রাতে ইমন টেলিফোন করল তার মা'কে। তার গলা কাঁদো কাঁদো। গলা শুনে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই সে কেঁদেছে। কান্না শেষ হয় নি। এখনো বুকে জমে আছে।

ইমন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাবা আমাকে সাইকেল গিফট করেছে।

রেবেকা বললেন, এটা তো খুবই আনন্দের ঘটনা। অ্যান্ডারসনের সিক্সথ সেন্স কাজে লেগেছে। আনন্দের ঘটনায় তুমি বোকা ছেলের মতো কাঁদছ কেন ?

জানি না। কেন জানি আমার শুধু কান্না পাচ্ছে।

তুমি কি আমার কাছে চলে আসতে চাও ?

হ্যাঁ।

তোমার বাবাকে বলো, সে তোমাকে দিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

আরেকটু ভেবে তারপর বলো। গাড়ি কি পাঠাব ?

হ্যাঁ, পাঠাও।

পাঠাচ্ছি। লক্ষ্মীসোনা, কাঁদবে না।

ছেলের কান্নার শব্দে শওকত বের হয়ে এলো। তার নিজের বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগল। কেন ছেলেটা এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে ? তার ছোট্ট হৃদয়ে এত কী কষ্ট!

শওকত বলল, বাবা, কী হয়েছে ?

ইমন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি না কী হয়েছে। আমি কনফিউজড।

কেন বাবা ?

ইমন নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল, আমি কেন তোমাদের দু'জনের সঙ্গে থাকতে পারছি না— এটা ভেবে কনফিউজড।

কাছে আসো, তোমাকে আদর করে দেই।

ইমন শান্ত গলায় বলল, না। Please, don't touch me.

কিছুক্ষণ আগে গাড়ি এসে ইমনকে নিয়ে গেছে। সে কোনো স্মৃতিচিহ্ন রেখে যায় নি। মা'র কাছ থেকে আসার সময় যা যা নিয়ে এসেছিল, খুব গুছিয়ে প্রতিটি জিনিসই তার ব্যাক প্যাকে ভরেছে।

শওকত ভেবেছিল— পাজেরো জিপ স্টার্ট নিয়ে যখন সামনে যেতে থাকবে, তখন ইমন জানালা দিয়ে মাথা বের করে একবার হলেও হাত নাড়বে। বিদেশী বাচ্চাদের মতো 'বাই' বা এই জাতীয় কিছু বলবে। তা সে বলে নি। জানালা দিয়ে মাথাও বের করে নি।

শিশুদের মনোজগৎ আলাদা। তারা তাদের ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়ে অনেক হিসাব-নিকাশ করে। সেই হিসাব-নিকাশের রহস্য বড়রা বুঝতে পারে না।

ইমন চলে যাবার পর শওকতের নিজেকে ভারমুক্ত মনে হলো। যেন এই ক'দিন মাথার উপর অদৃশ্য চাপ ছিল। এখন সেই চাপটা নেই। মানুষ হিসেবে সে এখন মুক্ত মানুষ। শুধু একটা সমস্যা হচ্ছে, বাসাটা হঠাৎ জনমানবশূন্য মনে হচ্ছে। যেন এই বাসায় কিছুদিন আগেও অনেক লোক বাস করত, এখন কেউ নেই। আবারও পুরনো অবস্থায় ফিরে যেতে সময় লাগবে।

শওকত ঘর তালাবন্ধ করে বের হলো। একা একা কিছুক্ষণ হাঁটবে। বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। একসময় ফিরলেই হলো।

তৌফিকের বাসায় যাওয়া যায়। ছবি এঁকে সে খুব নাম করেছে। জাপান ন্যাশনাল মিউজিয়ামে তৌফিকের একটা পেইন্টিং আছে। প্রায়ই শোনা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তার ছবির শো হচ্ছে। হঠাৎ খ্যাতিতে তৌফিক বদলেছে কি-না তা দেখে আসা যায়। বছর ছয় আগেও তৌফিকের সঙ্গে দেখা হওয়া ছিল আতঙ্কজনক ব্যাপার। তৌফিক অবধারিতভাবে জাপ্টে ধরে বলবে— দোস্ত, পকেটে যা আছে সব দিয়ে দে। আমার অবস্থা ভয়াবহ।

সেই তৌফিক ধানমণ্ডিতে বিশাল ফ্ল্যাট কিনেছে। সেই ফ্ল্যাটে ছবি আঁকার স্টুডিও না-কি দর্শনীয়।

রাস্তায় নেমেই তৌফিকের বাসায় যাবার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে শওকত টেলিফোনের দোকানে ঢুকে গেল। ইমন বাড়িতে ঠিকমতো ফিরেছে কি-না জানা দরকার। রেবেকাই টেলিফোন ধরল।

কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রেবেকা বলল, ইমন ঠিকমতো ফিরেছে। তুমি কি কথা বলবে ইমনের সঙ্গে ?

শওকত বলল, ইমন কী করছে ?

লেবুর শরবত বানিয়ে দিয়েছি, শরবত খাচ্ছে।

তোমরা নিউইয়র্ক কবে যাবে ?

টিকিটের উপর নির্ভর করছে। টিকিট পেলেই চলে যাব।

যাবার তারিখটা কি জানাবে ?

জানাব। তোমার কোনো ফোন নাম্বার আছে যেখানে জানাতে পারি ?

না নেই।

লোক পাঠিয়ে খবর দেব। রাখি তাহলে।

রেবেকা টেলিফোন রেখে দেবার পর শওকতের মনে হলো, ইমনের সঙ্গে কথা বলা হলো না। সে কি আবার টেলিফোন করে ইমনকে চাইবে ? তেমন বিশেষ কোনো কথাও তো নেই যে এই মুহূর্তেই বলতে হবে। 'কেমন আছ ইমন ? এখন কী করছ ? মা'কে দেখে ভালো লাগছে ?'— এর বাইরে তো আর কিছু নেই জিজ্ঞেস করার মতো।

শওকত আনিকাকে টেলিফোন করল। আনিকা ঘুম ঘুম গলায় বলল, কী ব্যাপার ?

শওকত বলল, কয়টা বাজে ?

আনিকা বলল, কয়টা বাজে জানার জন্যে টেলিফোন করেছ ? দশটা পঁচিশ।

বলো কী! এত রাত হয়েছে ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

হ্যাঁ।

তাহলে রাখি, পরে কথা হবে।

ঘুম যখন ভাঙিয়েই দিয়েছ, কথা বলো। ছেলে কোথায় ?

মা'র কাছে চলে গেছে।

একা একা লাগছে, সেই জন্যে টেলিফোন ?

হয়তোবা।

চলে যাবার সময় ছেলে কি কান্নাকাটি করেছে ?

না।

তোমার ছেলে খুব শক্ত। তুমি বোধহয় জানো না সে আমাকে খুব পছন্দ করেছে।

জানি। সে বলেছে।

কী বলেছে ?

অদ্ভুত কথা বলেছে। সে বলেছে, আনিকার গানের গলা ক্রিস্টেল গেইলের চেয়েও ভালো।

ক্রিস্টেল গেইল কে ?

আমি জানি না কে। আমেরিকান কোনো পপ সিঙ্গার হবে। আমাকে ইমন অনুরোধ করেছে— তোমার একটা গানের সিডি যেন তাকে দেই। তুমি যে গান গাইতে পার, তাই তো আমি জানি না।

জানার চেষ্টা কর নি বলে জানো না। আশেপাশের মানুষদের প্রতি তোমার কৌতূহল খুব কম।

হয়তো কম।

ভাত খেয়েছ ?

না।

তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে, তোমার মনটা খুব খারাপ। সম্ভব হলে আমি এসে তোমাকে ভাত খাইয়ে যেতাম। বুঝতেই পারছ সেটা সম্ভব না।

বুঝতে পারছি।

আজ রাতে খামারের মালিকের সঙ্গে চাইনিজ খেয়েছি। তার সঙ্গে চাইনিজে যাওয়ার ব্যাপারটা না থাকলে আমি আসতাম। আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল তোমার ছেলে সন্ধ্যাবেলা চলে যাবে। ভালো কথা, খামার মালিকের সঙ্গে চাইনিজ খাওয়ায় তুমি রাগ করো নি তো ?

রাগ করব কেন ?

ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে। সামান্য বোকা, সেটা কিছু না। ভদ্রলোক এমন ভাব করছিলেন যেন তিনি অতি তুচ্ছ একজন। আর আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী। রূপে মিস এশিয়া।

ভালো তো!

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা প্রেমিক হিসেবে মোটেই ভালো না। কিন্তু স্বামী হিসেবে অসাধারণ। আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা।

প্রেমিকরা আদর্শ স্বামী হয় না ?

হয় না। তারা আদর্শ স্বামী যেমন হয় না, আদর্শ পিতাও হয় না। তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি কি আদর্শ পিতা ?

না।

রাগ করলে আমার কথায় ?

না।

প্লিজ রাগ করো না। তোমাকে রাগানোর জন্যে আমি কিছু বলছি না। তুমি অসহায় একজন মানুষ। অসহায় মানুষকে রাগাতে নেই।

অসহায় মানুষকে কী করতে হয় ? করুণা ?

হ্যাঁ, এরা করুণাভিক্ষা করে জীবন পার করে দেয়। করুণা পেতে পেতে এরা অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন করুণা না পেলে তাদের ভালো লাগে না।

তুমি কি আমার মালিককে বিয়ে করার কথা ভাবছ ?

একেবারেই যে ভাবছি না তা না। রাতে যখন ঘুমুতে গেছি, তখন মনে হয়েছে— আগের চ্যাপ্টারটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা চ্যাপ্টার লেখা শুরু করলে কেমন হয়!

আমার মতামত চাও ?

আমি কীভাবে আমার জীবন সাজাব সেটা আমি ঠিক করব। অন্যের মতামত কেন নেব! এখন বাসায় যাও। খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমাও।

আনিকা, আমার ছেলে তোমার জন্যে একটা গিফট রেখে গেছে। একদিন এসে নিয়ে যাবে।

কী গিফট ?

এক মুঠো পার্ল। সে মোমবাতি দিয়ে পার্ল বানিয়েছে।

তোমার ছেলের মতো শান্ত বুদ্ধির ছেলে আমি আমার জীবনে দেখি নি। আমার জীবনে অনেক হতাশা আছে। তোমার ছেলেকে দেখে আরেকটা হতাশা যুক্ত হয়েছে।

সেটা কী ?

আমার কেন কোনোদিন এরকম একটা ছেলে হবে না!

কেন হবে না ? অবশ্যই হবে!

আনিকা হঠাৎ বলল, তোমার সঙ্গে এখন আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। রাখি।

শওকত বাসায় ফিরল না। রাত সাড়ে এগারোটার সময় তৌফিকের বাসার দরজার কলিংবেল বাজাল। তৌফিক নিজেই দরজা খুলে দিল। উল্লসিত গলায় বলল, আরে তুই! দি গ্রেট 'শ'। (তৌফিক শওকতকে ডাকে 'শ'। এই 'শ' না-কি শওকতের 'শ' না, শালা'র 'শ'।)

শওকত বলল, আছিস কেমন ?

চমৎকার আছি। বাসায় পার্টি চলছে। তরল নেশা, বায়বীয় নেশা— সব ব্যবস্থাই আছে। তুই ভালো সময়ে এসেছিস। বারটা এক মিনিট থেকে বাঁশি শুরু হবে। ওস্তাদ মিনু খান এসেছেন। নাম শুনেছিস মিনু খানের ?

না।

বলিস কী! তুই কোন ভুবনে বাস করিস যে মিনু খানের নাম জানিস না ?

জমজমাট পার্টিতে ঢুকে শওকত অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। অপরিচিত সব নারী-পুরুষ। তাদের চোখের দৃষ্টি ঘোরলাগা। গলার স্বর জড়ানো। তৌফিক শওকতকে পরিচয় করিয়ে দিল— হলেও হতে পারত মহান শিল্পী দি গ্রেট শ।

একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন চেঁচিয়ে বলল, চিয়ার্স। কেউ একজন হাতের গ্লাস দেয়ালে ছুড়ে ফেলল। এই জাতীয় পার্টিতে আনন্দমাত্রা অতিক্রম করলে গ্লাস ভাঙতে হয়। তাই নিয়ম।

রাত বারটা এক মিনিটে ওস্তাদ মিনু খান বাঁশিতে বেহাগ বাজাতে শুরু করলেন। তৌফিক বড় একটা ক্যানভাসের সামনে রঙ-তুলি নিয়ে বসল। বেহাগের সুর সে ক্যানভাসে আনবে। এই উদ্দেশ্যেই আজকের পার্টি।

বাঁশিতে বেহাগ বাজছে। তৌফিক ব্রাশ টানছে। তার ব্রাশের টানে কোনো দ্বিধা নেই। যেন সে জানে সে কী করছে।

শওকত ঘরের এক কোনায় বসে আছে। তৌফিকের শক্ত হাতে ব্রাশ টানা দেখতে তার ভালো লাগছে। সতের-আঠার বছরের অত্যন্ত রূপবতী এক তরুণী এসে শওকতকে বলল, আপনি শুধু হাতে বসে আছেন— এটা কেমন কথা! খুব ভালো রেড ওয়াইন আছে। পর্তুগিজ। এনে দেব ?

শওকত বলল, না। আমার শরীর খারাপ।

আপনার কী হয়েছে ?

আমি একজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ।

তাই না-কি ? মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কোনো মানুষের সঙ্গে আমি আগে কখনো গল্প করি নি। আপনার সঙ্গে কি গল্প করতে পারি ?

হ্যাঁ পারেন।

আচ্ছা বলুন তো, বাঁশির সুর কি কোনো পেইন্টার তার ক্যানভাসে ধরতে পারেন ?

দু'টা দু'রকম জিনিস।

কোন অর্থে দু'রকম ? সুর এবং রঙ আলাদা কোন অর্থে ?

আপনি কি সত্যি জবাবটা চান ?

আপনার কি মনে হয় আমি জবাবটা চাই না ?

শওকত বলল, আপনি জবাবটা শুনতে চাচ্ছেন না। আপনার কথা বলতে ভালো লাগছে বলেই আপনি কথা বলছেন।

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

শওকতেরও উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। আবার ছবিটা কী দাঁড়ায় সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে। শওকতের মনে হলো ইমনকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে এলে সে মজা পেত। একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর আরেকজন সেই বাঁশির সুর ক্যানভাসে ধরতে চেষ্টা করছে। ছোটদের অদ্ভুত জগতে এই ঘটনা অতি রোমাঞ্চকর।

ওস্তাদ বাঁশি ভালো বাজাচ্ছেন। ছবি তত ভালো হচ্ছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। নীল রঙের নানান শেড পড়ছে। বেহাগের রঙ কি নীল ?

শওকত ভাই! একা একা ঝিম ধরে বসে আছেন কেন ? আমাকে চিনতে পারছেন ?

স্কার্ট পরা লাল চুলের এই মহিলাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে গলার স্বর চেনা। মিষ্টি গলা।

আমি রুমা!

ও আচ্ছা রুমা ভাবি! আমি চিনতে পারি নি। ঘরে ঢোকার পর থেকে মনে মনে খুঁজছিলাম— তৌফিকের বউ কোথায় ?

রুমা বলল, চিনতে পারার কথাও না। আয়নায় যখন নিজেকে দেখি, খুবই অচেনা লাগে। চুল রঙ করিয়েছি। থ্যাবড়া নাক ছিল, তিন হাজার পাউন্ড খরচ করে নাক ঠিক করেছি। নাক ঠিক হয়েছে না ? আপনি আর্টিস্ট মানুষ, আপনি ভালো বলতে পারবেন।

শওকত বলল, ভাবি, আমি এখন আর্টিস্ট না। আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি।

ছাড়লেন কেন ?

ভালো লাগে না।

বাঁশির সুরের সঙ্গে ছবি আঁকার ব্যাপারটা আপনার কাছে কেমন লাগছে ?

তেমন ভালো লাগছে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্টের ফরম বদলাবে। অনেক 'পপ' জিনিস ঢুকে যাবে। আর্টকে জনপ্রিয় করার জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

আছে হয়তো।

হয়তো বলবেন না ভাই। নিশ্চয়ই আছে। আগে ক্রিকেট খেলা হতো পাঁচদিন, এখন হচ্ছে ওয়ানডে। সময়ের সঙ্গে সবকিছুকেই তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

শওকত হাসল। রুমা ভাবির মতো একশ' পারসেন্ট খাঁটি বাঙালি মেয়ের তর্ক করার ভঙ্গিতে কথা বলা দেখতে মজা লাগছে।

ভাই, আপনার হাত খালি কেন ? অন্য কিছু না খান, শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে, শ্যাম্পেন খান। আমার সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে শ্যাম্পেন খেতে হবে। নিয়ে আসি ? আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।

বিশেষ দিনটা কী ?

আজ আমাদের বিয়ের দিন। আপনি কেন ভুলে গেলেন ? আমরা গোপনে কাজি অফিসে গিয়ে বিয়ে করলাম। আপনি সাক্ষী ছিলেন। আমাদের হাতে কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। আপনি আমাদের তিনশ' টাকা দিলেন। মনে পড়েছে ?

ঘটনাটা মনে পড়েছে। কত টাকা দিয়েছিলাম মনে নাই।

আমার মনে আছে। টাকাটা আপনি দিয়েছিলেন আমার হাতে। কী কষ্টের দিন যে গেছে! পুরনো দিনের কথা আমার অবশ্য মনে পড়ে না। অ্যালকোহল বেশি খেয়ে ফেললে তখন মনে আসে। ভাই, আনি আপনার জন্যে এক গ্লাস শ্যাম্পেন ?

আনুন।

আপনার বন্ধু স্পেনে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। ঐসব দেশে বাড়িঘর কেনা খুব সহজ। সামান্য কিছু ডাউন পেমেন্ট করলেই কেনা যায়। একবার আসুন না স্পেনে ? আপনাদের মতো আর্টিস্টদের জন্যে ইন্টারেস্টিং জায়গা।

শওকত আবারও হাসল। পার্টি তার ভালো লাগতে শুরু করেছে। ঘরের আলো কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ওস্তাদ বংশিবাদক ভালো বাজাচ্ছেন।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচু গলায় গল্প করছেন। মাঝে-মাঝে গ্লাসের টুং টাং শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বিদেশী কোনো ছবির দৃশ্য। মন্দ কী!

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে শওকত প্রায় ফিসফিস করে বলল—

এইখানে এই তরুর তলে
তোমায় আমায় কৌতূহলে
যে কটি দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।

রুমা তার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে চলে গেছে। একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করলেও এখন আর কেউ চোখ সরু করে তার দিকে তাকাবে না। শওকত কবিতা মনে করার চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না।

শওকত ঘোরলাগা মাথায় অনেক রাতে বাসায় ফিরল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, আবার ঘুম আসছে না এমন অবস্থা। এই অবস্থার সুন্দর ইংরেজি নাম আছে। নামটা মনে আসছে না। ইমন বাসায় থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেত। ইমন নেই। আবার কখনো কি তাকে পাওয়া যাবে? পাঁচ সাত আট বছর পর হয়তো সে এলো। তখন যদি বলা হয়— হ্যালো বেবি, চা বানানো মনে আছে? খুব কড়া করে এক কাপ চা বানাও। দুধ-চিনি সবই বেশি বেশি দেবে।

ইমনের আর না আসাই ভালো।

অভ্যস্ত জীবনে হঠাৎ ঘূর্ণির কোনো প্রয়োজন নেই। সবাই সবার নিজের জীবনে থাকুক। প্রতিটি জীবন নদীর মতো। একটা নদীর সঙ্গে আরেকটা নদীর মিলে-মিশে যাওয়া খুব খারাপ ব্যাপার।

শওকত রাত সাড়ে তিনটায় মগ ভর্তি করে চা বানাল। ঘুমানোর আগে কড়া এক কাপ চা খেলে তার ঘুম ভালো হয়। আজ এমনিতেই ভালো ঘুম হবে, তারপরেও অভ্যাস ঠিক রাখা। মানুষ এমন এক প্রাণী যে যে-কোনো মূল্যে অভ্যাস ধরে রাখার চেষ্টা করে। সব কিছু চলে যাক, শুধু অভ্যাসটা থাকুক।

ঘুম আসছে না। অনেকদিন পর তাকে অনিদ্রা ব্যাধিতে ধরেছে। আধ্যাত্মিক মানুষদের ব্যাধি এপিলেপ্সি, আর সৃষ্টিশীল মানুষদের ব্যাধি অনিদ্রা। সে এখন কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ না। সে এখন হাবুগাবু মানুষ। হাবুগাবুরা খায়-দায়, বাথরুমে যায়, রাতে আরাম করে ঘুমায়।

জানালায় দিনের আলো ঢোকার পর শওকত ঘুমুতে গেল। পাশাপাশি দুটা বালিশ। একটা তার জন্যে, আরেকটা ইমনের জন্যে। ইমনের বালিশের এখন আর প্রয়োজন নেই। এই বালিশ সরিয়ে ফেলা ভালো। স্মৃতির মতো অস্পষ্ট বায়বীয় কোনো বিষয় জমা করতে নেই। শওকত ইমনের বালিশটা তুলে নিজের মাথার নিচে রাখতে গিয়ে দেখল, বালিশের নিচে ক্রিস্টমাস ট্রি আঁকা খাম। খামের উপর বাংলায় লেখা— 'বাবা'।

ভেতরের কার্ডটা ইংরেজিতে লেখা। ক্রিসমাসের অভিনন্দন। কার্ডের সাদা পৃষ্ঠায় ইমন আবার সবুজ পেন্সিল দিয়ে গুটি গুটি করে ইংরেজিতে আট-নয় লাইন লিখেছে। ইংরেজির বাংলা তরজামা অনেকটা এরকম—

> আমি কল্পনায় ভেবে রেখেছিলাম তুমি কেমন। কল্পনার সঙ্গে মোটেও মিলে নি। তুমি কল্পনার বাবার চেয়েও অনেক বেশি ভালো। তুমি ছবি আঁকা ভুলে গেছ কেন? ছোটরা অনেক কিছু ভুলে যায়, বড়রা তো ভোলে না। তুমি কেন ভুলে গেলে?

ইমন খুব আগ্রহ করে কী যেন আঁকছে। এলিয়েনের ছবি হবার সম্ভাবনা। শিশুরা একটা বয়সে এলিয়েনের ছবি আঁকতে পছন্দ করে। আমেরিকান শিশু মনস্তত্ত্ববিদরা বিষয়টা নিয়ে নানান গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হচ্ছে। মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে, এলিয়েনদের ছবি আঁকা শিশুর মনোজগতের এলিয়েনেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত না।

রেবেকা এসে ছেলের পাশে বসলেন। ইমন মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল। আবার ছবি আঁকায় ফিরে গেল। ছবি আঁকায় ছেলের ভালো ঝোঁক আছে। জেনেটিক কোনো কারণ কি আছে ? বাবার ছবি আঁকা চলে এসেছে ছেলের মধ্যে ?

হ্যালো ইমন।

হ্যালো।

বাবার কাছে এই ক'দিনে কী করলে কিছু তো বললে না ?

কিছু করি নি।

কিছুই করো নি ?

গল্প করার মতো কিছু করি নি।

ঘরে বসে সময় কাটিয়েছ ?

হুঁ।

বাবার ছবি আঁকা দেখেছ ?

না।

দেখ নি কেন ?

বাবা ছবি আঁকা ভুলে গেছে।

তোমার বাবা তোমাকে এ কথা বলেছে ?

হ্যাঁ।

তুমি জিজ্ঞেস করো নি কেন ? একটা মানুষ এত সুন্দর ছবি আঁকত, সে ছবি আঁকা কীভাবে ভুলে গেল ?

ইমন জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ খানিকটা শক্ত হয়েছে। লক্ষণ ভালো না। সে মনে হয় আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না। তাকে সহজ করার বুদ্ধি হচ্ছে, আর কোনো প্রশ্ন না করে নিজের মনে বকবক করে যাওয়া। রেবেকা এখন যদি অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে, তাহলে ইমনের মুখের চামড়ার শক্ত ভাঁজ কোমল হতে শুরু করবে।

রেবেকা গল্প শুরু করলেন, তোমার বাবার স্পেশালিটি কী ছিল জানো ? পেন্সিল পোট্রেট। সে কী করত শোন— হাতে একটা পেন্সিল নিত, যার পোট্রেট আঁকতে হবে তার দিকে পাঁচ-ছয় মিনিট তাকিয়ে থাকত। তারপর অতি দ্রুত তার ছবিটি আঁকত। যখন আঁকত তখন সে আর অন্য কোনো দিকে তাকাত না। তার পোট্রেট আঁকার দৃশ্য দেখতে পারলে তুমি খুব মজা পেতে। দেখলে মনে হবে কাগজে ঝড় উঠছে। কিছুক্ষণ পরপর পটপট শব্দ।

ইমন আগ্রহ নিয়ে বলল, পটপট শব্দ কেন মা ?

পেন্সিলের শিস ভাঙার শব্দ। সে এত জোরে পেন্সিল টানত যে পেন্সিলের শিস ভেঙে যেত। এই জন্যে পোট্রেট করার সময় সে হাতের কাছে এক গাদা পেন্সিল রাখত।

বাবা কি তোমার কোনো পোট্রেট করেছে ?

একটা করেছে।

সেটা কোথায় ?

আমার কাছে আছে। এখানে না, নিউজার্সির অ্যাপার্টমেন্টে। যেদিন তুমি বিয়ে করবে সেদিন তোমাকে এই ছবিটা সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে গিফট করব। ইমন, তুমি বিয়ে করবে না ?

করব।

কী রকম মেয়ে করবে বলো তো দেখি।

বাবাকে একবার বলেছি। আবার বলতে ইচ্ছা করছে না।

রেবেকা বিস্মিত হয়ে বললেন, তাহলে তো তুমি বাবাকে অনেক গোপন কথা বলেছ। আমি যতদূর জানি মিস্টার অ্যান্ডারসনকেও তুমি অনেক গোপন কথা বলো। তাই না ?

হ্যাঁ।

মিস্টার অ্যান্ডারসন এবং তোমার বাবা— এই দু'জনের মধ্যে কাকে তোমার বেশি পছন্দ হয়েছে ?

ইমন ছবি আঁকা বন্ধ করে মা'র দিকে তাকাল। শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, তুমি আগে বলো তারপর আমি বলব।

রেবেকা ইমনের মতোই শান্ত গলায় বলল, তোমার বাবা ভালো।

ইমন সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাহলে তুমি বাবাকে বাদ দিলে কেন ?

রেবেকা জবাব না দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। ইমন মা'র দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে জবাব শুনতে চায়। শিশুরা মাঝে-মাঝে শক্ত অবস্থান নিতে পারে।

রেবেকা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, কিছু ব্যাপার আছে বড়দের। ছোটরা সেই ব্যাপারগুলি বুঝতে পারে না। তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে। তোমার বাবা অবশ্যই ভালো মানুষ কিন্তু তার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় নি। মনের মিল না হলে দু'জন মানুষ এক সঙ্গে থাকতে পারে না। বুঝতে পারছ ?

না।

তোমার স্কুলে একজন স্টুডেন্ট আছে না, বব নাম ? ববের সঙ্গে তোমার কি ভাব আছে ?

সে খুবই দুষ্ট।

তুমি একবার তার কাঁধে কামড় দিয়ে রক্তারক্তি করেছ। তুমি যেমন বলছ বব দুষ্ট, ঠিক একইভাবে বব তার মা'কে বলেছে তুমি দুষ্ট। এখন বলো তোমরা দু'জন কি একসঙ্গে থাকতে পারবে ?

না।

আমার এবং তোমার বাবার ব্যাপারটাও সে-রকম।

মিস্টার অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কি তোমার মনের মিল হয়েছে ?

হ্যাঁ হয়েছে। তাকে তো তুমিও খুব পছন্দ কর। করো না ?

হ্যাঁ।

যাকে তুমি পছন্দ করতে পার, তাকে তো আমিও পছন্দ করতে পারি। পারি না ?

হ্যাঁ পার।

তাহলে তুমি কাঁদছ কেন ?

ইমন চোখ মুছতে মুছতে বলল, I am sorry.

শুধু শুধু কাঁদবে না। ইমন কান্না বন্ধ কর।

ইমন প্রাণপণ চেষ্টা করল কান্না বন্ধ করতে। রেবেকা বলল, তুমি যদি আরো কিছু বলতে চাও বলতে পার। কিছু বলতে চাও ?

চাই।

বলো। আমি খুব মন দিয়ে তোমার কথা শুনব। তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।

ইমন কান্না থামানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, মা আমরা চারজন কি একসঙ্গে থাকতে পারি ?

রেবেকা অবাক হয়ে বললেন, চারজন মানে ? কোন চারজন ?

ইমন বলল, তুমি, বাবা, মিস্টার অ্যান্ডারসন এবং আমি।

না, ইমন এটা সম্ভব না। তবে তুমি যদি তোমার বাবার সঙ্গে থাকতে চাও, আমি সেই ব্যবস্থা করতে রাজি আছি। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে রেখে চলে যাব। থাকতে চাও তোমার বাবার সঙ্গে ?

ইমন না-সূচক মাথা নাড়ল। সে তার বাবার সঙ্গে থাকতে চায় না। রেবেকা বললেন, ইমন বাথরুমে যাও। চোখে-মুখে পানি দিয়ে আস। ইমন বাধ্য ছেলের মতো বাথরুমে ঢুকল।

বাথরুমের দরজা বন্ধ। কল ছাড়া হয়েছে। রেবেকা শুনতে পাচ্ছেন পানির শব্দের সঙ্গে ছেলের কান্নার শব্দ মিশে যাচ্ছে। তিনি বিড়বিড় করে বললেন—আহারে আমার বাবু। আহারে!

মতিয়ুর রহমান হাউমাউ করে কাঁদছেন। মনোয়ারা কাঁদছেন। তাঁদের জীবনে আজ আনন্দের একটা দিন। এই আনন্দে শব্দ করে কাঁদা যায়। কিছুক্ষণ আগে আনিকার বিয়ে হয়েছে। তিন লক্ষ টাকা কাবিন। পঞ্চাশ হাজার টাকা উসুল। আনিকা লাল রঙের বেনারসি পরেছে। তাড়াহুড়া করে শাড়ি কেনা হয়েছে, ব্লাউজ বানানো সম্ভব হয় নি। আনিকা পুরনো ব্লাউজ পরেছে। শাড়ি দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে ব্লাউজ দেখা যাচ্ছে না। লাল শাড়িতে এলোমেলো সাজেও আনিকাকে সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়স অনেক কমে গেছে।

মিতুর স্বামী ক্যামেরা হাতে ঘুরছে। প্রচুর ছবি তোলা হচ্ছে। বাবা-মা'র মাঝখানে আনিকা। বরের সঙ্গে আনিকা। বর আনিকাকে শরবত খাওয়াচ্ছে তার ছবি। কাজি সাহেব দোয়া পড়ছেন তার ছবি। সবাইকে খেজুর দেয়া হচ্ছে তার ছবি। এক পর্যায়ে আনিকা বলল, শওকত ভাইয়ের সঙ্গে আমি একটা ছবি তুলব। দীর্ঘদিন পর শওকতকে সে শওকত না ডেকে শওকত ভাই ডাকল।

ছবি তোলা হলো। আনিকা বলল, শওকত ভাই, আমি যে সত্যি সত্যি বিয়ে করে ফেলব তা বোধহয় ভাবেন নি?

শওকত বলল, না ভাবি নি। আজ যে তোমাদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান তাও ভাবি নি।

অবাক হন নি?

হ্যাঁ হয়েছি।

আমি যখন খুব জরুরি খবর পাঠালাম, ইমনের বানানো মোমের মুক্তা নিয়ে চলে আসুন, তখনো নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারেন নি?

বুঝতে পারি নি।

আনিকা বলল, আমি ভেবে রেখেছিলাম বিয়ে যখন পড়ানো হবে, তখন আমার গলায় মুক্তার মালা থাকবে। সমস্যা হলো, এই মুক্তাগুলি দিয়ে মালা

গাঁথা যায় না। সুই ঢুকাতে গেলেই মুক্তা ভেঙে যায়। আপনার ছেলের কাছ থেকে জেনে নেবেন তো কী করে মালা গাঁথা যায়? সে কি দেশে আছে, না চলে গেছে?

দেশে আছে। আগামীকাল রাত তিনটায় চলে যাবে।

তার টেলিফোন নাম্বার দিন। আমি তার সঙ্গে কথা বলব। তার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়েছিল। আমি যখন বিয়ে করব, আমি তাকে জানাব। সে যখন বিয়ে করবে, সে আমাকে জানাবে। আমরা দু'জন দু'জনের বিয়েতে উপস্থিত থাকব।

শওকত টেলিফোন নাম্বার দিল। আনিকা বলল, আপনি আমার বরের সঙ্গে কথা বলুন। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলব। আরেকটা কথা, আপনি কিন্তু না খেয়ে যাবেন না। আজকের রান্না আমি নিজে রেঁধেছি। জীবনে কখনো শুনেছেন কোনো মেয়ে তার নিজের বিয়ের রান্না নিজে রেঁধেছে?

না, শুনি নি।

এখন বুঝতে পারছেন তো আমি খুব অন্যরকম একটা মেয়ে?

বুঝতে পারছি।

সিন্দাবাদের ভূত ঘাড় থেকে নেমে গেছে। নিজেকে হালকা লাগছে না শওকত ভাই?

শওকত কিছু বলল না। আনিকা বলল, সবার সঙ্গে বসে থাকতে যদি আপনার অস্বস্তি লাগে, আপনি মিতুর ঘরে বসতে পারেন। মিতুর ঘর খালি আছে। কিংবা আপনি রাগ-চৌকিতেও বসতে পারেন। রাগ-চৌকিও খালি।

শওকত বলল, তুমি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না। আমি ভালো আছি।

আনিকা বলল, ভালো থাকলেই ভালো। আজ একটা শুভদিন। আমি চাই শুভদিনে সবাই ভালো থাকুক।

ঘরোয়াভাবে বিয়ে। বরের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন এসেছে। মিতু তার শ্বশুর এবং স্বামীকে নিয়ে এসেছে। বাইরের লোক বলতে শওকত।

শওকত বারান্দায় রাগ-চৌকিতে বসতে গিয়ে দেখে, মধ্যবয়স্ক এক লোক ফুটফুটে একটা মেয়ে নিয়ে রাগ-চৌকিতে বসে আছে। সেই লোক শওকতকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, স্যার ভালো আছেন?

শওকত বিস্মিত হয়ে বলল, ভালো আছি। আপনাকে কিন্তু চিনতে পারছি না।

আমার নাম আকবর। এটা আমার মেয়ে, নাম উজ্জলা। এখন কি চিনেছেন?

না।

আকবর গলা নামিয়ে বলল, আপনাকে আর আপাকে মগবাজার কাজি অফিসে নিয়ে গিয়েছিলাম। আপার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা ছিল।

ও আচ্ছা। আপনি সেই লোক ?

আকবর বলল, আপা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। হঠাৎ উনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। উনি আমাকে মোবাইলে খবর দিলেন। উনার কাছে আমার মোবাইল নাম্বার আছে।

ভালো তো।

আপনার কিছু লাগলে আমাকে বলবেন। ব্যবস্থা করব। আমি এই বাড়ির ঘরের মানুষের মতো। চা খাবেন ?

আমি কিছু খাব না। থ্যাংক য়্যু।

আপনি বিশ্রাম করেন, আমি কাজ-কর্মের অবস্থা দেখি। আপার কোনো ভাই না থাকায় সমস্যা হয়েছে। বিয়ে-শাদির মতো অনুষ্ঠানে কাজকর্ম করতে পারে এমন পুরুষমানুষ দরকার।

আকবর তার কন্যাকে নিয়ে চলে যাবার পর পর আনিকার বর জামাল এসে পাশে বসল। শওকত বলল, একদিন আমি আপনার খামারবাড়ি দেখতে যাব।

জামাল বলল, অবশ্যই যাবেন। রাতে থাকবেন। শহর থেকে যে সব গেস্টরা যান, তাদের জন্যে রেস্টহাউসের মতো বানিয়েছি। তিনটা ঘর আছে। একটায় এসি লাগানোর ব্যবস্থা রাখা আছে। এখনো লাগানো হয় নি।

গণ্ডগ্রামে এসি দেয়া ঘর! ভালো তো।

আপনার দেখতে ভালো লাগবে। গেস্ট হাউসের সামনের ফুলের বাগান সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে করা। মালী অবশ্য আছে।

জামাল ছেলেটাকে শওকতের পছন্দ হলো। তার চোখে স্বপ্ন আছে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সে এগোচ্ছে। এই ধরনের ছেলেরা সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

শওকত ভাই, আপনার কথা আমি আমার স্ত্রীর কাছে অনেক শুনেছি। একদিন যদি গ্রামে আসেন খুব খুশি হবো।

শওকত হাসল। পনেরো মিনিট হয় নি বিয়ে হয়েছে। এখনই সে এমনভাবে বলছে 'আমার স্ত্রী' যে শুনতে ভালো লাগছে। এত অহঙ্কার নিয়ে 'আমার স্ত্রী' বোধহয় এর আগে কেউ বলে নি।

ছেলেটার চেহারা ভালো। গায়ের রঙও নিশ্চয়ই ফর্সা ছিল। রোদে পুড়ে সেই রঙ তামাটে হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা এই রঙ খুব পছন্দ করে। ছেলেটা এখন কথা বেশি বলছে, তবে সে খুব বেশি কথা বলে এমন মনে হচ্ছে না। বিয়ের উত্তেজনায় জড়তা কেটে গেছে। মানসিক উত্তেজনা একেক মানুষকে একেকভাবে বদলায়।

শওকত তাকিয়ে আছে— জামাল চিটাগাং-এর হলদিয়া নদীর রুইপোনা কীভাবে ঢাকায় এনেছে তার গল্প করছে। গল্প বলার ভঙ্গি থেকে সবারই মনে হবে, এটা কোনো দুর্দান্ত ডিটেকটিভ গল্প। মাছের পোনা আনা হচ্ছে না, এনরিচড ইউরেনিয়াম আনা হচ্ছে। পদে পদে ক্লাইমেক্স!

গল্প যেখানে এন্ড ক্লাইমেক্সের দিকে যাচ্ছে সেখানে আনিকা ঢুকল। জামালের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, এই, তোমার সঙ্গে একটা মাইক্রোবাস আছে না ?

জামাল বলল, আছে।

আনিকা বলল, আমি ঠিকানা দিচ্ছি, ড্রাইভারকে পাঠাও আমার বড়খালা আর ছোটখালাকে নিয়ে আসবে।

জামাল বলল, আমি সঙ্গে যাই ? উনারা মুরুব্বি মানুষ। ড্রাইভার দিয়ে উনাদের আনানো ঠিক হবে না।

আনিকা বলল, তোমার যেতে হবে না। তোমার এখানে কাজ আছে। ড্রাইভারকে কিছু টাকা দিয়ে দাও, এক লিটারের ছয়টা কোক আনবে, তিনটা সেভেন আপ আনবে। ঠাণ্ডা হয় যেন।

আর কিছু ?

আর কিছু লাগবে না। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস। ঘামে মুখ তেলতেলা হয়ে আছে।

জামাল শওকতের দিকে তাকিয়ে বলল, ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়ে বাকি গল্পটা বলব। আমাকে শুধু ধরিয়ে দিতে হবে। যেখানে শেষ করেছি, সেখান থেকে শুরু করব। কোথায় শেষ করেছি মনে আছে তো ?

শওকত বলল, মনে আছে। একসময় আপনার কাছে মনে হলো পানিতে অক্সিজেন কমে আসছে। কারণ মাছের পোনাগুলি ঘনঘন পানিতে ভেসে উঠছে।

জামাল বলল, এটা সমস্যার মাত্র শুরু। সবটা না শুনলে বুঝবেন না। এক্ষুণি আসছি।

জামাল অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হলো। শওকত বলল, তোমরা এত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছ দেখে ভালো লাগছে।

আনিকা বলল, ও একটু বোকা। এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলাটা যে খুবই অস্বাভাবিক— বোকা বলেই সে তা ধরতে পারছে না।

তুমি অতি বুদ্ধিমতী হয়েও কিন্তু স্বাভাবিক আচরণ করছ।

আনিকা বলল, মেয়ে হলো পানির মতো। বর্ণহীন। যে পাত্রে তাকে রাখা হবে সে সেই পাত্রের রঙ তার গায়ে মাখবে। বোকার সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে, তার হাভভাব হয়ে যাবে বোকার মতো। আর সেটাই ভালো।

তোমার আনন্দিত মুখ দেখতে ভালো লাগছে।

আনিকা বলল, ভালো লাগলেই ভালো। কিছুক্ষণ আগে আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাকে আমি আমার বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে আসছে। তার মা গাড়ি দিয়ে তাকে পাঠাচ্ছেন।

শওকত বিস্মিত হয়ে বলল, তাই না-কি!

আনিকা বলল, আমিও খুব অবাক হয়েছি। আপনার ছেলে বলেছে তাকে দশ-পনেরো মিনিট সময় দিলেই সে মুক্তার মালা বানিয়ে দেবে। আলপিন গরম করে মুক্তোর গায়ে ফুটো করতে হবে। আপনি চা খাবেন?

শওকত বলল, না।

আমার খুব চা খেতে ইচ্ছা করছে। আপনি যদি খান, আমি আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খাব। বাকি জীবনে আর হয়তো আপনার সঙ্গে চা খাওয়া হবে না। আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পড়ে থাকব গ্রামে।

চাকরি? তোমার চাকরির কী হবে?

আনিকা বলল, চাকরি করব না। স্বামীর খামার দেখব। হাঁস-মুরগি পালব। স্বামীর সেবা করব। ভাগ্য ভালো হলে ইমনের মতো সুন্দর বুদ্ধিমান দু'একটা ছেলেমেয়ে হয়তো আমাদের হবে। তাদেরকে আদর-মমতা-ভালোবাসায় বড় করব। আপনার কি মনে হয়— আমি পারব না?

শওকত বলল, অবশ্যই পারবে। তোমার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তুমি পারবে।

থ্যাংক য়্যু। আমি পারতে চাই।

ইমনের মুক্তার মালা তৈরি হয়েছে। সময় বেশি লেগেছে, কারণ পুরনো মুক্তা ফেলে দিয়ে মোম গলিয়ে নতুন মুক্তা বানানো হয়েছে। কাজটা ইমন একা করে নি, শওকত তাকে সাহায্য করেছে। যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দু'জন কাজ করেছে সেই মনোযোগ দেখার মতো। শেষপর্যায়ে জামাল এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। দেখা গেল মুক্তা বানানোর ব্যাপারে তার স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। হাত না কাঁপিয়ে সে গলন্ত মোম ফেলতে পারে। একটা মুক্তা আরেকটা মুক্তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে না।

মুক্তার মালা গলায় দিয়ে আনিকা ইমনকে কোলে নিয়ে গালে চুমু দিল। তারপর নিচু হয়ে শওকতকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। তখনো ইমন তার কোলে।

চুমু খাওয়ায় ইমন যতটুকু লজ্জা পেয়েছিল, সালাম করায় শওকত ঠিক ততটুকুই লজ্জা পেল।

আনিকা বলল, শওকত ভাই! আমি আপনার ছেলেকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। আপনি আমাদের দু'জনের একটা পোট্রেট করে দিন। কাগজ আর গাদাখানিক পেন্সিল আমি আনিয়ে রেখেছি। আজ সারা দুপুর বসে বসে পেন্সিল কেটেছি। ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছি। এই দেখেন কাটা আঙুল।

শওকত বলল, ছবি আঁকা ভুলে গেছি আনিকা।

চেষ্টা করে দেখুন। তাকান আমাদের দিকে। আমাদের দেখতে সুন্দর লাগছে না ?

শওকত তাকাল। সে অবাক হয়ে দেখল, আনিকার চোখ জলে টলমল করছে। শুধু তাই না, ইমনেরও চোখভর্তি জল। আহারে কী সুন্দর কম্পোজিশান। কী সুন্দর! কী সুন্দর! চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লেই এই কম্পোজিশান নষ্ট হয়ে যাবে। শওকতকে যা করতে হবে তা হচ্ছে এই দৃশ্যটা মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাদের দিকে আর তাকানো যাবে না। পোট্রেট করতে হবে স্মৃতি থেকে।

শওকত হাত বাড়িয়ে বলল, দেখি কাগজ দেখি।

অতি দ্রুত সে পেন্সিল টানছে। কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না। অন্যদিকে তাকানোর সময় তার নেই। অনেক অনেক দিন পর তার মাথায় পুরনো ঝড় উঠেছে। কী ভয়ঙ্কর অথচ কী মধুর সেই ঝড়! ইমন এক গাদা পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার হাতের পেন্সিল ভেঙে যেতেই সে পেন্সিল এগিয়ে দিচ্ছে।

তার খুব ইচ্ছা করছে পোর্ট্রেটটা কেমন হচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখতে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে না দেখেও ইমন বুঝতে পারছে বাবা অসাধারণ একটা পোর্ট্রেট আঁকছেন।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই শওকতকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের চোখে কৌতূহল এবং বিস্ময়। একটু দূরে আনিকা দাঁড়িয়ে। সে ক্রমাগত কাঁদছে। আনিকার পাশে জামাল বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে। আনিকা তার দিকে তাকিয়ে বলল, এইভাবে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমি কাঁদছি দেখছ না ? আমার হাত ধর। না-কি হাত ধরতে লজ্জা লাগছে ?

জামাল হাত ধরল। নিচু গলায় বলল, এত কাঁদছ কেন ?

আনিকা ধরা গলায় বলল, শওকত ভাইয়ের একটা অসুখ হয়েছিল। অসুখটা আমি সারিয়ে দিয়েছি। এই আনন্দে কাঁদছি।